নিবেদন

মহামতি রাণাডের "Rise of the Maratha Power" ও কাপ্তান্ গ্রাণ্ট ডফের ইতিহাস অবলম্বনে এই ক্ষুদ্র পুস্তকটি রচিত হইয়াছে।

কলিকাতা ন্যাসনাল্ কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর ও হিন্দি হিত-বার্ত্তা-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপড়ার কর মহাশয় প্রুফ সংশোধন ও দুই একটি ঐতিহাসিক ভ্রম নিরাকরণ করিয়া দিয়া আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। তাঁহাদের আনুকূল্য না পাইলে অনেকগুলি মারাঠা নামের বানান ভুল রহিয়া যাইত। তাঁহাদের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

বোলপুর, শান্তিনিকেতন
২৭এ শ্রাবণ, ১৩১৫

শ্রীশরৎকুমার রায়

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

ভূমিকা

ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা বিদ্যালয়ে পড়িয়া থাকি, তাহা রাজাদের জীবনবৃত্তান্ত, দেশের ইতিবৃত্ত নহে।

দেশের লোকের সমগ্র চিত্তে যখন কোনো একটি অভিপ্রায় জাগিয়া উঠে এবং সর্ব্বসাধারণে সচেষ্ট হইয়া সেই অভিপ্রায়কে সার্থক করিতে চায় ও সেই অভিপ্রায়কে প্রতিকূল আঘাত হইতে বাঁচাইবার জন্য ব্যূহবদ্ধ হইয়া উঠে, তখনই সে দেশ যথার্থভাবে ইতিহাসের ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়ায়।

এইরূপ কোন একটি এক-অভিপ্রায়কে লইয়া ভারতবর্ষের কোনো একটি প্রদেশ আপনাকে একচিত্ত বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছে, এরূপ অবস্থা ভারতবর্ষের ভাগ্যে অধিক ঘটে নাই।

কোনো দেশের লোক যখন এইরূপে ঐক্য উপলব্ধি করে, তখন তাহারা স্বভাবতই সেই উপলব্ধিকে ইতিহাসে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। যে সকল ঘটনা বিচ্ছিন্ন, যাহা আকস্মিক,দেশের লোকের চিত্তে যাহার কোনো অখণ্ড তাৎপর্য্য নাই, দেশের লোক তাহাকে সহজেই ইতিহাসরূপে গাঁথিয়া রাখে না, কারণ গাঁথিয়া রাখার কোন একটি সূত্র তাহারা নিজেদের মনের মধ্যে পায় না।

এইজন্য আধুনিক ভারতের রাজকীয় বৃত্তান্ত অধিকাংশই বিদেশীর লেখা। দেশের সাধারণ লোকে এই সকল বৃত্তান্ত স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য কোন উৎসাহ বোধ করে নাই।

সমগ্র দেশের কোন বিশেষ কালের ইতিহাসকে রক্ষা করিবার স্বতঃপ্রবৃত্ত চেষ্টা দেশের লোকের দ্বারা যদি ভারতবর্ষের কোথাও ঘটিয়া থাকে, সে মহারাষ্ট্র দেশে। মহারাষ্ট্রের 'বখরগুলি' তাহার নিদর্শন।

যে সময় লইয়া এই সকল জাতীয় ইতিবৃত্ত রচিত হইতেছিল, সেই সময়ে দেশের লোকে যে আপনাদের একটি অঙ্গবদ্ধ স্পষ্টসত্তা অনুভব করিয়াছিল, তাহা এই ইতিহাস লিখিবার প্রবৃত্তির দ্বারাই নিশ্চিত সপ্রমাণ হইতেছে।

রাজপুতনাতেও ইতিহাসের টুক্‌রা পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা এক একটি দলের, এক একটি খণ্ড রাজ্যের ইতিহাস; সমস্ত রাজপুত জাতির ইতিহাস নহে। কিন্তু মারাঠাদের সম্মিলিত পরিচয় আছে; তাহা কেবল এক একটি গোত্র-বিশেষের গৌরবকীর্ত্তন নহে।

শিখগুরুদের ইতিহাসের মধ্যে শিখদের জাতীয় ইতিহাস রচিত হইয়াছে, কিন্তু মারাঠার ইতিহাসের মত এমন ব্যাপক এবং সাঙ্গোপাঙ্গ হইয়া উঠে নাই। শিখের ইতিহাসে বীরত্বের ও মহত্ত্বের অনেক পরিচয় আছে, কিন্তু তাহাতে সুপরিণত রাষ্ট্রগঠনের ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। মারাঠারা কেবলমাত্র বীরত্ব করে নাই, তাহারা রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছিল।

অতএব আধুনিক ভারতের যদি কোন প্রদেশের ইতিহাস থাকে, এবং সেই ইতিহাস হইতে যদি ঐতিহাসিক তত্ত্ব কিছু শিক্ষা করা যাইতে পারে, তবে তাহা মারাঠার ইতিহাস হইতে।

ইংলণ্ডে এক সময়ে ব্রিটনেরা ছিল—ডেন্‌দের সহিত

স্যাক্‌সনদের সহিত তাহাদের লড়াই চলিত। মাঝে হইতে রোমাণেরা কিছুদিন তাহাদের উপর আধিপত্য করিয়া গেল। তাহার পরে নর্ম্মাণেরা এই দ্বীপ অধিকার করিয়া লইল। এই সকল কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছেঁড়ির বৃত্তান্তে ইতিহাসের মূর্ত্তি প্রস্ফুট নহে। কিন্তু ইংলণ্ডে যখন হইতে জাতি গড়িয়া উঠিতে লাগিল, নানা শক্তির মন্থনে যখন হইতে দেশের চিত্ত সজাগ হইয়া আপনার লক্ষ্য নির্ণয় ও তাহার পথ পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল, তখন হইতে ইংলণ্ডের ইতিহাস যেন দেহ ধারণ করিল এবং এই ইতিহাস মানুষের শিক্ষার বিষয় হইয়া উঠিল।

ভারতবর্ষেও মোগলপাঠানে মিলিয়া রক্তবর্ণ নাট্যমঞ্চে যে অভিনয় করিয়া গিয়াছে, তাহাতে রসের অভাব নাই, কিন্তু তাহাতে ইতিহাস জমিয়া উঠে নাই। সুতরাং তাহা পড়িয়া আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের ঐতিহাসিক শিক্ষা লাভ হয় না।

ভারতবর্ষে কেবল মারাঠাজাতির ও শিখজাতির কিছু-কালের ইতিহাসে যথার্থ ঐতিহাসিকতা আছে। কি নিয়মে, কিসের প্রেরণায় জাতি গড়িয়া উঠে, কিসের শক্তিতে তাহার উন্নতি হয় এবং কিসের অভাবে তাহার পতন ঘটে, ঘরের দৃষ্টান্ত লইয়া যদি কেহ সেই তত্ত্বের আলোচনা ভারতবর্ষে করিতে চায়, তবে কেবলমাত্র মারাঠা ও শিখের ইতিহাস তাহার সম্বল।

অথচ বাংলার বিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের যে ইতিহাস পড়ানো

হয়, তাহাতে মোগলপাঠানের বৃত্তান্ত সকলের চেয়ে বড় জায়গা জুড়িয়া আছে; সেই বৃত্তান্ত দেশের লোকের বৃত্তান্ত নহে; সেই বৃত্তান্তে ভারতবর্ষ কেবল উপলক্ষ্যমাত্র; অর্থাৎ ভারতবর্ষ এই বৃত্তান্তের ফ্রেম মাত্র, ছবি নহে। এই বিদেশী রাজাদের কীর্ত্তিকাহিনীর সংশ্রবে মারাঠা ও শিখের যেটুকু ইতিহাস আমাদের ছাত্রেরা পড়িতে পায়, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। অথচ আধুনিক ভারতবর্ষের কেবল এই অংশমাত্রেই দেশের লোকের ইতিহাস বলিতে যদি কিছু থাকে তাহা আছে।

প্রায়ই জাতীয় অভ্যুত্থানের মূলে এক বা একাধিক মহাপুরুষ আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু এ কথা মনে রাখিতে হইবে, সেই সকল মহাপুরুষ আপন শক্তিকে প্রকাশ করিতেই পারিতেন না, যদি দেশের মধ্যে মহৎভাবের ব্যাপ্তি না হইত। চারিদিকে আয়োজন অনেকদিন হইতেই হয়; সেই আয়োজনে ছোট বড় অনেকেরও যোগ থাকে; অবশেষে শক্তিশালী লোক উঠিয়া সেই আয়োজনকে ব্যবহারে প্রয়োগ করেন।

মারাঠার ইতিহাসে আমরা শিবাজীকেই বড় করিয়া দেখিতে পাই। কিন্তু শিবাজী বড় হইয়া উঠিতে পারিতেন না, যদি সমস্ত মারাঠাজাতি তাঁহাকে বড় করিয়া না তুলিত। বহুদিন হইতে বহু ধর্ম্মবীর দেশের উচ্চনীচের, ব্রাহ্মণশূদ্রের কৃত্রিম ব্যবধান ভেদ করিয়া পরস্পরের মধ্যে যোগ সাধন করিতেছিলেন। ভক্তির রাজপথকে তাঁহারা ইতর ও বিশিষ্ট সকলেরই জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এক ভগবানের অধিকারে তাঁহারা দেশের সকলকে সমান গৌরবের অধিকারী

করিয়াছিলেন। মারাঠায় ধর্ম্মান্দোলনে দেশের সমস্ত লোক একত্র মথিত হইতেছিল। শিবাজীর প্রতিভা সেই মন্থন হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তাহা সমস্ত দেশের ধর্ম্মোদ্বোধনের সহিত জড়িত, এইজন্যই দেশের শক্তিতে তিনি ধন্য ও তাঁহার শক্তিতে দেশ ধন্য হইয়াছে।

যদি এ কথা সত্য হইত যে, শিবাজী প্রতিভাশালী দস্যু মাত্র, তিনি নিজের স্বার্থসাধন ও ক্ষমতাবিস্তারের জন্য অসামান্য কৌশল প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তবে তাঁহার সেই দস্যুতাকে অবলম্বন করিয়া কখনই সমস্ত মারাঠাজাতি এক হইয়া উঠিত না। বিশেষতঃ শিবাজী যখন অওরঙ্গজেবের জালে জড়িত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল তাঁহাকে রাজ্য হইতে দূরে যাপন করিতে হইয়াছিল, তখনো যে তাঁহার কীর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ হয় নাই, তাহার একমাত্র কারণ, সমস্ত দেশের ধর্ম্মবুদ্ধির সহিত তাঁহার চেষ্টার যোগ ছিল। বস্তুতঃ, তাঁহার সাধনা সমস্ত দেশেরই ধর্ম্মসাধনার একটি বিশেষ প্রকাশ। এই ধর্ম্মসাধনার আহ্বানেই খণ্ড খণ্ড মারাঠা আপনার বিচ্ছিন্ন শক্তিকে একত্র সম্মিলিত করিয়া মঙ্গল উদ্দেশ্যের নিকট নিবেদন করিতে পারিয়াছিল, লুণ্ঠনের ভাগ লইয়া, ক্ষমতার ভাগ লইয়া পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করে নাই।

অবশেষে যখন এক দিন এই ধর্ম্মসাধনা স্বার্থসাধনে বিকৃত হইয়া গেল, যখন সমস্ত দেশের শক্তি আর একত্র মিলিতে পারিল না, তখন পরস্পর অবিশ্বাস, ঈর্ষ্যা, বিশ্বাসঘাতকতা বটগাছের কুটিল শিকড়জালের মত মারাঠাপ্রতাপের বিশাল

হর্ম্ম্যকে ভিত্তিতে ভিত্তিতে দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়া দিল। ধর্ম্ম সমস্ত জাতিকে এক করিয়াছিল, এবং স্বার্থ ই তাহাকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দিয়াছে—ইহাই মারাঠা অভ্যুত্থান ও পতনের ইতিহাস। ব্যক্তিগত মহাশক্তির সঙ্গে দেশের শক্তিকে মিলাইতে পারে ধর্ম্মের যোগ; কিন্তু ব্যক্তিগত শক্তি যখন স্বার্থকে অবলম্বন করে, তখন সমস্ত দেশের শক্তি কখনই তাহার সঙ্গে এক হইয়া মিলিতে পারে না।

ধর্ম্মের উদার ঐক্য দেশের ভেদবুদ্ধিকে নিরস্ত করিয়া দিলে তবেই দেশের অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তি একত্র মিলিত হইয়া অভাবনীয় সফলতা লাভ করে, ইহাই মহারাষ্ট্র ইতিহাসের শিক্ষা, ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে প্রবল প্রতাপও আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছত্রপতি শিবাজী

শিবাজী ও মারাঠাজাতি

দেশ ও জাতি

ইংরাজ মুসলমানদের হাত হইতে ভারতবর্ষ জয় করিয়া লইয়াছেন, একথা ঠিক নহে। ভারতবর্ষের রাজ্য লইয়া হিন্দুদের সঙ্গেই ইংরাজের লড়াই বাধিয়াছিল। ইংরাজ যখন এদেশে রাজা হইবার জন্য চেষ্টা পাইলেন, তাহার অনেক পূর্ব্বেই মোগলরাজ্য প্রায় চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। একদিকে মহারাষ্ট্রে তখন মারাঠা, আর একদিকে পাঞ্জাবে শিখজাতি জাগিয়া উঠিয়াছে। ইংরাজেরা মারাঠাদিগের সহিত ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ ও শিখদিগের সহিত ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করেন। ইংরাজ রাজা হইয়া বসিবার কিছু পূর্ব্বেই মারাঠারা ভারতবর্ষে প্রবল হইয়াছিল। তাহাদিগের প্রভুত্ব দক্ষিণে মধ্যদাক্ষিণাত্য, কর্ণাট, তাঞ্জোর ও মহীশূর, উত্তরে গুজরাট, কাঠিয়াবাড়, বেরার, মধ্যপ্রদেশ, মালব, বুন্দেলখণ্ড, রাজপুতনা, রোহিলখণ্ড, দোয়াব, আগ্রা ও দিল্লী পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা বঙ্গদেশ ও অযোধ্যা জয়ের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, ইংরাজেরা বাধা দেওয়াতে কৃতকার্য্য হয় নাই। দিল্লীর সম্রাটেরা পঞ্চাশ বৎসরকাল তাহাদের হাতে যেন খেলার পুতুলের মত ছিলেন। যে জাতি এত বড় শক্তি লাভ করিয়াছিল, সে জাতি কি কেবল একজনের হাতে গড়িয়া উঠিয়াছিল? একাদিক্রমে বহুসংখ্যক প্রতিভাশালী মহাত্মা

এই জাতির জীবন-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভাষা, ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য—সর্ব্বদিক্ হইতে এই জাতি উন্নতির অনুকূল উপাদান সংগ্রহ করিতে পাইয়াছিল। বিদেশীরা বলেন, ভারতবর্ষের নানাজাতির মধ্যে কোনজাতিই জাতীয় ঐক্যভাবকে জন্ম দিতে পারে নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকেও একথা স্বীকার করিতে হইয়াছে যে,রাজপুত, শিখ ও মারাঠা—এই তিন জাতির সম্বন্ধে এই অপবাদ খাটে না। শিখদের জাতীয় ঐক্যভাব প্রধানতঃ খালসা সৈন্যদলে বদ্ধ ছিল, রাজপুতদিগের ঐ ভাবটি বিচ্ছিন্ন ও সংকীর্ণরূপে বিরাজ করিতেছিল, মহারাষ্ট্র দেশে এই ঐক্যের আহ্বান জাতিকে জাগরিত করিয়াছিল। এদেশের সমস্ত লোকই সৈন্যের কার্য্য করিত; বৎসরের ছয়মাস যুদ্ধ করিত, অপর ছয়মাস ঘরে থাকিয়া চাষ আবাদ করিয়া কাটাইত। এইরূপ সৈন্যদলকে সহায় করিয়াই মারাঠা দেশনায়কেরা হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের অভিলাষ করিয়াছিলেন। বিদেশী ইতিহাসলেখকদিগের মনে একথা একেবারেই উঠে নাই যে, মহারাষ্ট্র দেশে রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে প্রবল সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আন্দোলন দেশবাসীদিগকে ঐক্যের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। সেই আন্দোলন দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোককে সচেতন করিয়াছিল। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, মুসলমানেরা হিন্দুদিগের প্রতি উৎপীড়ন করিতেন বলিয়া শিবাজী তাহাদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; কিন্তু কেবল-মাত্র মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের প্রতি বিরুদ্ধভাব মারাঠাদের অভ্যুত্থানচেষ্টার একমাত্র কারণ নহে। আসল কথা এই,

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে সমস্ত ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে, ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্য প্রভৃতির একটা সংস্কারের যুগ আসিয়াছিল। মুসলমানদের সঙ্গে কেবল বিরুদ্ধ সংঘর্ষের আঘাতেই যে এই সংস্কারচেষ্টা জাগিয়াছিল, তাহা সত্য নহে। বরঞ্চ মুসলমান ধর্ম্ম ও সাহিত্যের সংস্পর্শই যে তখনকার হিন্দুচিত্তে একটি বিশেষ উত্তম সঞ্চার করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। মুসলমানভাব হিন্দুভাবের উপর ক্রিয়া করিয়া স্থাপত্য, চিত্র, সঙ্গীত, সাহিত্য, ধর্ম্ম, বেশভূষা, সামাজিক আচার সমস্তকেই কিছু-না-কিছু নূতনরূপে গড়িয়া তুলিতেছিল। সেই জন্যই দেখিতে পাই, তখনকার ধর্ম্মের আন্দোলনে ব্রাহ্মণদেরই বিশেষ কর্ত্তৃত্ব ছিল না, এবং তাহার পরিণতি প্রাচীন শাস্ত্রমত ও লোকাচারেরই অনুসরণ করিয়া চলে নাই।

সকল জাতীয় সাধু, কবি, দার্শনিক ও ভক্ত এই সংস্কার-উদ্যোগের মূলে ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ ছিলেন ব্রাহ্মণ, কেহ দর্জ্জি, কেহ মিস্ত্রী, কেহ মালী, কেহ কুমার, কেহ নাপিত, কেহ বা অতি নিকৃষ্ট জাতি। তুকারাম, রামদাস, বামন পণ্ডিত, একনাথ ইঁহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আজ দুই শত বৎসর পরেও মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপর ইঁহাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

মহারাষ্ট্র দেশের শাসনপ্রণালীর মধ্যে একটা বিশেষত্ব ছিল। ঐ বিশেষত্ব ইহার একটা দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ হইলেও ইহাই বিশেষ বিশেষ বিপদে দেশকে রক্ষা করিয়াছিল। কখনো কোন নায়কের অধীনে সমগ্র মহারাষ্ট্র দেশ অখণ্ড রাজ্য হইয়া গড়িয়া উঠে নাই। দেশটি কতকগুলি খণ্ড ক্ষুদ্র স্বাধীন-

রাজ্যের সমষ্টি ছিল। ক্ষমতাশালী দেশনায়কেরা খণ্ডরাজ্য-গুলির শক্তিকে সংহত করিয়াছিলেন। ছত্রপতি শিবাজী সর্ব্বপ্রথমে খণ্ড রাজ্যগুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিয়া একটি অধিরাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার সময়ে অধিরাজ্যের শক্তি খুব প্রবল ছিল। শিবাজীর মৃত্যুর পরে প্রভুত্ব ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া পড়িয়াছিল। ছত্রপতি শিবাজী দেশের সমস্ত শক্তি আপন হস্তে আনিবার চেষ্টা না করিয়া খণ্ড রাজ্যের নায়ক-দিগের হস্তে দিয়াছিলেন। ইহার ফলে, তিনি যখন দিল্লীতে বন্দী হইয়াছিলেন, যখন একটি একটি করিয়া তাঁহার দুর্গগুলি মোগলদিগের করায়ত্ত হয়, তখনো সমগ্র দেশ মুসলমানদিগের পদানত হইল না। দেশনায়কেরা ধীরে ধীরে দক্ষিণমহারাষ্ট্রে সমবেত হইতে লাগিলেন; শিবাজী মুক্তিলাভ করিবামাত্র অত্যল্পকালমধ্যে তাঁহারা মোগল সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। শিবাজী অচিরে তাঁহার হৃত রাজ্য ও দুর্গগুলি অধিকার করিয়াছিলেন। প্রায় এক শতাব্দীকাল এই অধিরাজ্য খণ্ড রাজ্যগুলির মধ্যে ঐক্যরক্ষা করিতে এবং দেশের সমগ্রশক্তিকে একই উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত করিতে পারিয়াছিল। তজ্জন্যই মারাঠা নায়কেরা অবলীলাক্রমে দিল্লীর সম্রাট্, টিপু সুলতান, হায়দার আলি, ইংরাজ, পর্ত্তুগিজ সকলকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রতিভাশালী দেশনায়কদিগের মৃত্যুর পরে খণ্ডতার মধ্যে ঐক্যরক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজ মহারাষ্ট্র জাতির রাজ্যশাসনপ্রণালীর এই দুর্ব্বলতায় আঘাত

করিয়াই তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইংরাজ এক একজন খণ্ডরাজ্যের নেতাকে প্রলুব্ধ করিয়া, অন্যের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করিয়া কৌশলে দেশ হস্তগত করেন।

প্রবল মোগলশাসনের পেষণের মধ্যে ভারতবর্ষে মহারাষ্ট্র-দেশ যে বিশেষভাবে স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রাকৃতিক ও সামাজিক অনুকূল কারণগুলি কি ছিল, এই স্থলে তাহা বলা হইবে।

প্রথমতঃ মহারাষ্ট্র দেশটির প্রাকৃতিক গঠন উক্ত দেশবাসী-দিগকে স্বাধীনতাপ্রিয় করিয়া তুলিবার পক্ষে অনুকূল। এই দেশের মানচিত্রের দিকে চাহিলেই দেখা যায় যে, দেশের অধিকাংশ স্থান দুর্গম শৈলমালায় আবৃত। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত সহ্যাদ্রি একদিকের এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত সাতপুড়া ও বিন্ধ্যগিরি অপর দিকের প্রাচীর হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। উচ্চ নীচ শৈলমালা দেশের নানা স্থানে থাকিয়া দেশটিকে বিচিত্র প্রকারে অসমতল করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার উপর ছোট ছোট গিরিনদীগুলি এই অসমতল দেশটিকে অধিকতর দুর্গম করিয়াছে। এমন বন্ধুর, এমন দুর্গম দেশ ভারতে আর দ্বিতীয় নাই। এইরূপ দেশের পাহাড়শ্রেণীর উপর নির্ম্মিত দুর্গগুলি অধিকার করা শত্রুর পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। ঐতিহাসিক কাপ্তান জেম্‌স্‌ গ্রাণ্ট্‌ ডফ্‌ লিখিয়াছেন, কোন বিখ্যাত সৈনিক স্বচক্ষে মহারাষ্ট্র দেশের প্রাকৃতিক গঠন দেখিয়া বলিয়াছেন—In a military point of view, there is probably no stronger country in the

world" অর্থাৎ রণনৈতিক হিসাবে বিচার করিলে বোধ হয় পৃথিবীতে এমন সুরক্ষিত দেশ আর নাই।

মহারাষ্ট্র দেশে শীত বেশী নহে, গ্রীষ্মও অল্প। অনুর্ব্বর পার্ব্বত্য দেশের অধিবাসী বলিয়া মারাঠারা কর্ম্মঠ, কষ্টসহিষ্ণু, মিতাচারী। দেশের গঠনই মারাঠাদিগকে স্বাধীনতাপ্রিয় করিয়া দিয়াছে। মহারাষ্ট্র দেশের আকৃতি মোটামুটি ত্রিভুজের মত। দেশের পরিমাণ একলক্ষ বর্গমাইলের অধিক হইবে না; অধিবাসীর সংখ্যা তিন কোটির কাছাকাছি।

আর্য্য ও অনার্য্যভাবের সমন্বয় মহারাষ্ট্র দেশের রাজনৈতিক উন্নতির দ্বিতীয় কারণ। আর্য্য ও অনার্য্যজাতির মিলন হইতেই ভারতীয় হিন্দুসমাজের উৎপত্তি হইয়াছে। উত্তর-ভারতে আর্য্য-ভাব প্রবল রহিয়া গিয়াছে; ফলে সেখানে ছোট বড় উচ্চনীচ বহুসংখ্যক জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে। জাতিভেদ সেখানে অধিকতর উগ্র। দক্ষিণ-ভারতের নিম্নাংশে অনার্য্যভাবের প্রাধান্য বলিয়া সেখানেও জাতিভেদের উগ্রতা অধিক। মহারাষ্ট্র পূর্ব্বোক্ত দুই প্রদেশের মধ্যস্থানে অবস্থিত, এবং এই-খানে আর্য্য ও অনার্য্য দুইজাতি পরস্পরের সহিত বনিবনাও করিয়া আশ্চর্য্যরূপে মিলিত হইয়াছে। এই দেশে দুইভাবের সমন্বয় হইয়াছে। মহারাষ্ট্র দেশে স্মার্ত্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায় আছে বটে, কিন্তু তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণতীরবর্ত্তী দক্ষিণ-ভারতে এক সম্প্রদায় যেমন অন্য সম্প্রদায়কে ঘৃণা করে, এদেশে তেমন পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা নাই। এখানে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র যেমন তুল্য অধিকার ভোগ করিয়া

মিলিয়া মিশিয়া থাকে, ভারতে অন্যত্র তেমন দেখা যায় না। ইহার কারণ এই যে, বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবে এদেশের নামে মাত্র শূদ্রগণ আপনাদিগকে হীন অবস্থা হইতে উন্নত করিয়া ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের তুল্য হইয়াছে। এদেশের শূদ্র বা পারিয়ারা এখন আর পতিত বলিয়া উক্ত হইতে পারে না। এ দেশের হীন জাতীয় সাধু বা সুকবিরা সমস্ত দেশবাসীর শ্রদ্ধা ভক্তি পাইয়াছেন।

সমাজের এই সমন্বয়ভাব মুসলমানদিগের উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এদেশের মুসলমানদিগেরও গোঁড়ামি নাই, তাহারা হিন্দুদিগের পালপার্ব্বণ ও উৎসবে যোগদান করিয়া আমোদ করে; হিন্দুরাও তাহাদের উৎসবে যোগদান করিতে দ্বিধা বোধ করে না। এদেশের কয়েকজন মুসলমান ফকির হিন্দু সাধুদের তুল্য সম্মান লাভ করিয়াছেন। বহু শতাব্দীর পরিবর্ত্তনে ও আন্দোলনে এই সাম্যনীতি সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ক্রমে ঐ সাম্য মারাঠাদিগের জাতীয় চরিত্রে পরিণত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রদেশে ধর্ম্ম ও সমাজে যে সাম্যভাব দেখা যায়, ভারতের অন্যত্র তেমন দৃষ্ট হয় না। ইহার ফলে মহারাষ্ট্র দেশে আর একটি বিশেষত্ব বহুদিন হইতে আরম্ভ হইয়া এখনও চলিয়া আসিতেছে। এখানে পল্লী-সমিতি ও পঞ্চায়েৎ প্রথা এখনও বিদ্যমান। বৈদেশিক শাসন মারাঠাদের গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনপ্রথার উপর হস্তক্ষেপ করে নাই, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই গ্রাম্যসমিতিগুলির উপকারিতা স্বীকার করিয়া ইহাদিগকে সম্পূর্ণ নষ্ট করেন নাই।

দেশের প্রাকৃতিক গঠন এবং দেশবাসীর সাম্যপ্রীতি পূর্ব্বোক্ত পল্লীসমাজগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ছোটখাটো স্বতন্ত্র সমাজে বাস করা মারাঠাদিগের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই ভাবটা দেশবাসীর অস্থিমজ্জাগত ছিল বলিয়া কোন হিন্দু বা মুসলমান শাসনকর্ত্তার অধীনে সমস্ত দেশ দীর্ঘকাল থাকিতে পারে নাই। উত্তরপূর্ব্ব এবং সুদূর দক্ষিণ-ভারতে কত সময় কত বড় বড় রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু মহারাষ্ট্রে কখনও দীর্ঘকালস্থায়ী কোন রাজ্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। মারাঠারা এইরূপ স্বতন্ত্র খণ্ডভাবে আপনাদের শাসন পরিচালনে অভ্যস্ত হইলেও, কোন বৈদেশিক আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইলে সমস্ত খণ্ডরাজ্যের অধিবাসীরা সমবেত হইতে জানিত। তাহারা এইরূপে অনেকবার উত্তর দেশীয় আক্রমণকারীদিগকে পরাজিত করিয়াছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর আরম্ভে মারাঠারা মহারাজ শালিবাহনের নেতৃত্বে শকজাতিকে পরাস্ত করে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চালুক্যবংশীয় মহারাষ্ট্র সম্রাট্ পুলকেশী সমবেত মারাঠা সামন্তদিগের সাহায্যে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে মহারাষ্ট্র দেশ রক্ষা করেন। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের পূর্ব্বেও মহারাষ্ট্র দেশ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রাচীন শাসনলিপি পাঠে জানা যায় যে, এদেশে নানা সময়ে নানা খণ্ড রাজ্য ক্ষমতাশালী হইয়াছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে মুসলমানেরা দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করে নাই; ইতঃপূর্ব্বে তাহারা প্রায় দুই শতাব্দী উত্তর-ভারতে রাজত্ব করিয়া তথায় আপনাদিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। একাদিক্রমে ত্রিশ বৎসর

যুদ্ধের পর মুসলমানেরা প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে এদেশের হিন্দুদিগকে পরাস্ত করিতে পারিয়াছিল। তখনো তাহারা পশ্চিম মহারাষ্ট্র ও কোঙ্কণ প্রদেশ জয় করিতে পারে নাই। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহারা কোঙ্কণ জয় করে। ঘাটমাথা প্রদেশ প্রকৃতপক্ষে কখনো মুসলমানের শাসনাধীন হয় নাই।

মহারাষ্ট্র দেশের পশ্চিমাংশে শৈল দুর্গগুলি হিন্দুনায়কদিগের শাসনাধীন ছিল ; ঐ অংশের অধিবাসীদিগের ভাষা ও আচার-ব্যবহারের উপর মুসলমান প্রভাব কিছুমাত্র কার্য্য করে নাই। পশ্চিম মহারাষ্ট্রে মুসলমানদের সংখ্যা এখনো অতি নগণ্য। উত্তর ও পূর্ব্ব-ভারতে মুসলমানদিগের মস্‌জিদ উচ্চতায় হিন্দু মন্দিরগুলিকে অতিক্রম করিয়া সহরের লোকবহুল অংশে শোভা পাইতেছে। মুসলমানদিগের ভয়ে হিন্দুরা নগরের গলি ঘুচিতে মন্দির স্থাপন করিতে বাধ্য হইতেন ; কখন কখন তাহাদিগকে অতি সঙ্গোপনে পূজা আরাধনা করিতে হইত। উত্তর-ভারতে মুসলমানদিগের ভাষা ও সাহিত্য হিন্দু সমাজের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সভাসমিতি, দরবারের কথা দূরে থাকুক, বাজারে, এমন কি, অন্তঃপুরেও মুসলমানী ভাষা ব্যবহৃত হইত। হিন্দুর ও মুসলমানের ভাষা মিলিয়া মিশিয়া উর্দ্দুভাষা উৎপন্ন হইয়াছে।

মহারাষ্ট্রদেশে মুসলমান শাসন এরূপ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। মুসলমানদিগের শাসনকালেও এদেশ-বাসীর ভাষা ও ধর্ম্ম স্বাধীনভাবে উন্নতিলাভ করিতেছিল। মহারাষ্ট্রে মুসলমানদিগের শক্তি ক্রমশঃ হিন্দু শক্তির অধীন

হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুরা কেমন করিয়া সর্ব্বদিকে ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন, একে একে তাহা দেখা যাউক ঃ—

(ক) উত্তরপশ্চিম প্রান্তরাজ্যের পরপারবর্ত্তী মুসলমান রাজ্যগুলি হইতে দলে দলে নূতন মুসলমান আসিয়া উত্তর-ভারতের মুসলমানদিগের দলপুষ্টি করিত। সুদূর দাক্ষিণাত্যের তুর্কী, পারসিক ও আবিশিনীয় আক্রমণকারীরা এইরূপ স্বজাতীয়দিগের সাহায্য পাইয়া প্রবল হইয়া উঠিতে পারে নাই।

(খ) বাহামনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হাসন দিল্লী নগরের গঙ্গু নামক জনৈক ব্রাহ্মণের ক্রীতদাস ছিলেন। গঙ্গু তাঁহার ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের কথা পূর্ব্বে বলিয়া দিয়াছিলেন। হাসন যখন রাজ্যলাভ করিলেন, তখন তিনি আপন প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য নিজের রাজ্যের নাম "বাহামনী" এবং নিজের নাম "হাসন গঙ্গু বাহামনী" রাখিলেন। দক্ষিণ দেশীয় মুসলমানেরা এমন করিয়া হিন্দু প্রভুকে সম্মান দেখাইতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। হাসন দিল্লী হইতে আপন প্রভু গঙ্গুকে আনাইয়া তাঁহাকে আপন রাজ্যের অর্থসচিব নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

এই বন্দোবস্তে রাজস্ব বিভাগের ও ধনকোষের কর্ত্তৃত্ব হিন্দুরা লাভ করিলেন। কিছুকাল দিল্লীর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়েরা এই বিভাগে কার্য্য করিয়াছিলেন, ক্রমে দক্ষিণী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা তাহাদের স্থান অধিকার করেন।

রাজস্ব বিভাগে মাত্র হিন্দুরা ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন এমন নহে, বাহামনী রাজ্য ভাঙ্গিয়া কালক্রমে যখন বিজাপুর, বেরার

আমেদনগর, বিদর, গোলকুণ্ডা, এই পাঁচটি মুসলমান রাজ্য গঠিত হয়, তখনো এই সকল রাজ্যে হিন্দুরা প্রবল ছিলেন। বাহামনী রাজ্যে সর্ব্বত্র পার্সী বা উর্দ্দু ভাষায় রাষ্ট্রসংক্রান্ত হিসাব লিখিত হইত।

(গ) আর এক কারণে মহারাষ্ট্রে হিন্দুপ্রভাব মুসলমান রাজ্যে বাড়িয়া উঠিতেছিল। ১৩৪৭ অব্দে দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগলকের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া প্রধান প্রধান মুসলমান জায়গীরদারেরা বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। বিজয়নগর ও তেলাঙ্গনের হিন্দু রাজার সাহায্য পাইয়াই তাঁহারা দিল্লীশ্বরকে দমন করিতে পারিয়াছিলেন। শক্তিশালী হিন্দুরাজারা মুসলমান রাজাদিগের ভাগ্যনিয়ামক হইয়া উঠিলেন। বিজয়নগরের রাজা এমন শক্তিশালী ছিলেন যে, তিনি বলপূর্ব্বক তৃতীয় বাহামনীরাজকে এই সর্ত্তে বাধ্য করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধাবসানে কোন পক্ষ নিরস্ত্র ব্যক্তিকে হত্যা করিতে পারিবে না। কি যুদ্ধবিগ্রহের কালে, কি শান্তির কালে, সকল সময়েই মুসলমান রাজারা হিন্দু দেশনায়কদিগকে ভয় করিয়া চলিতেন। অবশ্য তেলাঙ্গন ও বিজয়নগর রাজ্য মুসলমানেরা পরে ধ্বংস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিতান্ত সহজে তাঁহারা এই রাজ্য দুইটি অধিকার করিতে পারেন নাই। বহুকাল যুদ্ধের পরে বাহামনী রাজারা তেলাঙ্গন অধিকার করেন। বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য দাক্ষিণাত্যের পঞ্চ মুসলমান রাজ্যের রাজারা সমবেত হইয়া যুদ্ধ করেন। অনেককাল যুদ্ধের পর ১৫৬৫খ্রীঃ তালিকোটের যুদ্ধে তাঁহারা ঐ দেশ জয় করেন।

মহারাষ্ট্র দেশে মুসলমানেরা হিন্দুদিগের শক্তি খর্ব্ব করিয়া কখনো একাধিপত্য লাভ করিতে পারে নাই। সর্ব্বদাই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ক্ষমতা বিভক্ত হইয়া থাকিত। ভারতের অপর প্রদেশবাসী হিন্দুদিগের ন্যায় পরাধীন বলিয়া মারাঠারা হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে নাই। সেখানকার মুসলমান শাসনকর্ত্তা-দিগের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া দক্ষিণী মুসলমানেরা বিজয়নগর রাজ্যের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিতে লজ্জা বোধ করিত না। অন্যদিকে, মারাঠা শিলেদার ও বারগীরেরা মুসলমান রাজাদিগের সৈন্যদলভুক্ত হইত। দ্বিতীয় বাহামনী রাজের দুইশত শিলেদার শরীররক্ষক ছিল। মুসলমান সৈন্যদলভুক্ত হইয়া মারাঠারা যেমন অর্থ উপার্জ্জন করিত, তেমনি যুদ্ধবিদ্যায় দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছিল। যোড়শ শতাব্দীতে যখন মহারাষ্ট্র দেশ জাগিয়া উঠিল, তখন ঘাড়গে, ঘোরপড়ে, যাদব, নিম্বালকর, মোরে, শিন্দে, দফ্‌লে প্রভৃতি বংশীয় নায়কেরা একজনে দশবিশ সহস্র অশ্বরোহী সৈন্যের সেনাপতি ছিলেন, এবং প্রত্যেকেই তদুপযুক্ত জায়গীর ভোগ করিতেন। তুর্কী, আবিশিনীয়, পারসিক ও মোগলসৈন্য অপেক্ষা মুসলমান রাজারা মারাঠা সৈন্যদিগকে বেশী বিশ্বাসী বলিয়া জানিতেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে মারাঠার হিন্দুরা সৈন্যবিভাগে প্রাধান্য লাভ করিল।

(ঘ) অপর একটি কারণেও মহারাষ্ট্রে হিন্দুদিগের শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছিল। দাক্ষিণাত্যের মুসলমান শাসনকর্ত্তারা অনেকেই হিন্দু মহিলা বিবাহ করিতেন। বাহামনী রাজ্যের

সপ্তম রাজা বিজয়নগর রাজপরিবারের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। নবম বাহামনীরাজ সোনখেড়-প্রদেশীয় রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন। বিজাপুরের প্রথম রাজা ইস্থফ আদিল সাহেবের স্ত্রী,মুকুন্দরাও নামক জনৈক মারাঠা ব্রাহ্মণের ভগিনী। ইস্থফের মৃত্যুর পর এই হিন্দু রমণীর পুত্রেরাই সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন। বিদরের বারিদসাহী বংশের প্রথম রাজা জনৈক সম্ভ্রান্ত মারাঠার কন্যার সহিত আপন পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। এইরূপে হিন্দু-মুসলমানে বৈবাহিক সম্বন্ধ মুসলমান রাজ্যগুলিতে হিন্দুশক্তি বাড়াইয়া তুলিয়াছিল।

যে সকল হিন্দু মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদিগের দ্বারাও হিন্দুদিগের ক্ষমতা বাড়িয়া উঠিতেছিল। আমেদনগরের প্রথম মুসলমান রাজা জনৈক মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন। বেরারের ইমাদসাহী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাও ব্রাহ্মণ-তনয়। তাঁহার পিতা বিজয়নগররাজের অধীনে কার্য্য করিতেন। তিনি মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে বন্দী হইয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন। বিদরের প্রথম মুসলমান রাজা মারাঠাদিগের এতদূর প্রিয় হইয়াছিলেন যে, চারিশত মারাঠা সৈন্য মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত হয়। এই সৈন্যগণ তাঁহার প্রধান বিশ্বাসী সৈন্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

উল্লিখিতরূপে মহারাষ্ট্রদেশে হিন্দু মুসলমানেরা এমন ভাবে মিলিয়া গিয়াছিল যে, এদেশের মুসলমানেরা কদাচ

গোঁড়া হইয়া উঠিতে পারে নাই। সময়ে সময়ে মুসলমানেরা যে সামান্য অত্যাচার করিয়াছে, তাহা উল্লেখযোগ্য নহে। সাধারণতঃ এদেশে মুসলমানেরা হিন্দু প্রজাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেন এবং সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্যের ক্ষমতা তাহাদিগের হস্তে অর্পণ করিতেন। ক্রমে বাহুবলে ও বুদ্ধি-কৌশলে শাসন ও সৈন্যবিভাগে হিন্দুরাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

মহারাষ্ট্র দেশে হিন্দুমুসলমানে প্রীতি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কোন কোন মুসলমান রাজা হিন্দু মন্দিরের সেবার জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি দিতেন এবং সরকারী চিকিৎসালয়ে হিন্দুচিকিৎসক নিয়োগ করিতেন। কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্মোত্তর দেওয়া হইত।

মুসলমান শাসনে হিন্দুদিগের ক্ষমতা লেশমাত্র ব্যাঘাত না পাইয়া দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছিল। ক্রমশঃ হিন্দুরা এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, মুসলমানেরা নামে মাত্র শাসনকর্ত্তা ছিলেন, হিন্দুরাই রাজ্যের সর্ব্বত্র ক্ষমতা চালনা করিত।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুরারাও নামক এক ব্যক্তি গোলকুণ্ডা রাজ্যে প্রধান মন্ত্রী ছিলেন ; শেষ গোলকুণ্ডারাজের রাজত্বকালে মদন পণ্ডিত মন্ত্রীর কার্য্য করিতেন। বিজাপুর রাজ্যে রাজস্ববিভাগের সংস্কারভার এসু পণ্ডিত ও দাদোপন্ত নর-সোপণ্ডকালের উপর অর্পিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা আমেদনগরে দৌত্য কার্য্য করিতেন। বিজাপুররাজ যখন মোগলদিগের সঙ্গে

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন অকন্না ও মাকন্না নামক দুই ভ্রাতা তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। ইঁহারা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে গোলকুণ্ডা, বিজাপুর ও বিজয়নগর, এই রাজ্যত্রয়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন। ওয়াদ্মোজি জগদেব রাও নায়েক কর্ণাটদেশের সমস্ত নায়েকওয়াড়ি হিন্দু সৈন্যের কর্ত্তা ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত তিনরাজ্যে তিনি যাহাকে ইচ্ছা রাজপদে নিযুক্ত করিতেন। জগদেব রাও রাজা উপাধি গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু তিনিই রাজশক্তির চালক ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুরার রাও জগদেব বিজাপুর রাজ্যে কার্য্য করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সৈন্য চালনা করিয়া মোগলদিগের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়াছিলেন। সাহজী ভোঁসলা আমেদনগররাজের প্রধান সহায় ছিলেন। এই সময়ে বহু শক্তিশালী ব্যক্তি মহারাষ্ট্র দেশে জাগিয়া উঠিতেছিলেন। ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গোলকুণ্ডা, বিজাপুর, আমেদনগর ও বিদর, এই মুসলমান রাজ্যগুলির সকল ক্ষমতা মারাঠা রাজনীতিবেত্তা ও যোদ্ধাদিগের হস্তে আসিল। শৈলদুর্গগুলিও মারাঠা জায়গীরদারদিগের অধিকারগত হইল।

এইরূপে মারাঠাজাতি শক্তিশালী হইয়া যখন মুসলমান শাসনের বন্ধন ছিন্ন করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া উঠিল, তখন এক নূতন বিপদ্ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। আকবর হইতে আরম্ভ করিয়া অওরঙ্গজেব পর্য্যন্ত মোগল সম্রাট্‌গণ নর্ম্মদা ও তাপ্তী নদীর পরপারে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মহারাষ্ট্র দেশের হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতি

মহাত্রস্ত হইয়া পড়িল। দিল্লীশ্বরের অগণ্য সৈন্য ক্রমাগত তাহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরিত হইতে লাগিল। মারাঠা দেশনায়কগণের স্বাতন্ত্র্য তাঁহাদিগের সম্মিলনের অন্তরায় হওয়ায় তাঁহারা সমবেতভাবে মোগল সৈন্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিতেছিলেন না। তাঁহারা লুকাইয়া স্বতন্ত্রভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই উপায়ে কোন সুফল ফলিতেছিল না। এই নূতন বিপদে আত্মরক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদের সম্মিলন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। মহাত্মা শিবাজী দেশের এই প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে সমস্ত মারাঠি রাজ্যগুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মের নামে সমস্ত জাতিকে একই ক্ষেত্রে মিলাইয়া দিয়াছিলেন। শিবাজী তাঁহার সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি মাত্র ছিলেন এমন নহে; তিনি এমন একটা উদ্বোধন মহারাষ্ট্রে সঞ্চার করিয়াছিলেন, যাহা সমগ্র জাতিকে এক উদ্দেশ্য সাধনে একই কর্ম্মক্ষেত্রে মিলিত করিয়াছিল। মহারাষ্ট্র দেশে তিনি শক্তির সৃষ্টি করেন নাই, দেশের নানা অংশে যে শক্তি বিক্ষিপ্তভাবে ছিল, তিনি সেগুলির একীকরণ করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার প্রতিভার বিশেষত্ব।

বীজ

(১)

মহাত্মা শিবাজীর জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে মহারাষ্ট্র দেশের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা আলোচনা করা আবশ্যক।

ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া মোগলেরা আমেদনগর রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। প্রথমে ১৫৯৬ অব্দে আকবর সসৈন্যে এই রাজ্য আক্রমণ করেন। চাঁদবিবি অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া মোগল সম্রাট্ আকবরকে পরাজিত করেন। তারপর রাজ্যমধ্যে অন্তর্বিদ্রোহ ঘটিলে কুচক্রীরা চাঁদবিবিকে হত্যা করে (১৫৯৯ খ্রীঃ)। সেই সুযোগে মোগল সৈন্যেরা আমেদনগর দুর্গ অধিকার করে এবং রাজাকে বন্দী করিয়া বরাণপুরে পাঠাইয়া দেয়। রাজপক্ষীয় লোকেরা বিনাযুদ্ধে রাজ্য ছাড়িয়া দিল না; তাঁহারা প্রথমে পুরন্দর এবং পরে জুন্নর দুর্গে রাজধানী সরাইয়া লইল এবং নিজামসাহী বংশের একটি বালককে সিংহাসনে বসাইয়া মালিক অম্বর তাঁহার নামে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। মালিক অম্বর আবার আমেদনগর অধিকার করেন। তিনি মোগল ও বিজাপুরের আদিলসাহী রাজাদিগের সহিত বিশ বৎসর যুদ্ধ করেন। এই দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে শিবাজীর পিতা সাহজী, নিম্বালকর নায়ক ও লাখোজি যাদবরাও আমেদনগরের পক্ষ হইয়া মোগলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। মারাঠি নায়কেরা যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু মুসলমান ভূম্যধিকারিগণের অসদাচরণে অবশেষে তাঁহাদিগকে পরাজিত হইতে হয়। মালিক অম্বরকে বাধ্য হইয়া আমেদনগর ত্যাগ

করিতে হইল। তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার মোগল-দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এমন সময় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৬২৬ খৃঃ)।

ইতোমধ্যে সাহজী ভোঁসলা একবার নিজামপক্ষ ত্যাগ করিয়া মোগলসম্রাটের অধীনে পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের সেনাপতি হইয়াছিলেন। মালিক অম্বরের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র নিজামকে হত্যা করে (১৬৩১ খৃঃ)। সাহজী তখন আবার নিজামপক্ষ অবলম্বন করিয়া আর একজন উত্তরাধিকারীকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি কোঙ্কণ এবং নীরা নদী হইতে চাঁদোর শৈল পর্য্যন্ত রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। সাহজীর ক্ষমতা এতদূর বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, মোগল সম্রাট্ তাঁহাকে দমন করিবার জন্য পঁচিশ সহস্র সৈন্য প্রেরণ করেন। ১৬৩২-৩৬ চারি বৎসর কাল এই যুদ্ধ চলে। অবশেষে সম্রাট্ সাহজাহানের সৈন্যবলের নিকট সাহজীকে হার মানিতে হয়, এবং সম্রাটের অনুমতিক্রমে তিনি বিজাপুর রাজ-সরকারে চাকুরী গ্রহণ করেন। এদিকে আমেদনগর রাজ্য মোগলদের শাসনাধীন হওয়ায় ঔরঙ্গাবাদ সুবা গঠিত হইল। নাসিক ও খান্দেশের অংশ, সমস্ত বেরার এবং কোঙ্কণ দেশের উত্তরাংশ এই সুবাভুক্ত হইল। ভীমা ও নীরা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান বিজাপুররাজের ভাগে পড়িল।

বিজয়ী মোগলদিগের রাজ্যলাভের আশা বাড়িয়া গেল। তাহারা এখন বিজাপুর অধিকার করিবার জন্য যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। সাহজী ইতঃপূর্ব্বেই বিজাপুরের চাকুরী গ্রহণ করিয়া-

ছিলেন। তিনি কর্ণাট প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেখানে তিনি কাবেরী নদীতীরে কতক রাজ্য জয় করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে তিনি সেই স্থানের কর্ত্তা করেন। এদিকে বেরার, বিদর রাজ্যগুলি ইতঃপূর্ব্বেই ধ্বস্ত হইয়াছিল; সেই রাজ্যগুলির কিয়দংশ বিজাপুর, কিয়দংশ আমেদনগরভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। কেবলমাত্র গোলকুণ্ডা প্রদেশ নামেমাত্র স্বাধীন ছিল। গোলকুণ্ডার রাজা কর দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মোগলেরা ভীষণ কর হাঁকিল; তত কর দিতে তিনি অশক্ত হইলেও উহাতে তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। কারণ অওরঙ্গজেব অতর্কিতভাবে তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করিয়া অধিকার এবং রাজাকে বন্দী করেন।

ইংরাজেরা এই সময়ে মাথা তুলিয়া উঠে নাই। পর্ত্তুগীজেরা কোঙ্কণ রাজ্যের বন্দরগুলি রক্ষা করিবার উপযুক্ত আয়োজন করিতেছিল। শিবাজী যখন বালক, দাক্ষিণাত্যে তখন মোগলেরা রাজ্য বিস্তার করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া চেষ্টা করিতেছিল। মোগলদিগের অগণ্য সৈন্যের প্রতিকূলে দাঁড়াইবার সাধ্য তথাকার হিন্দু মুসলমান কোন রাজার ছিল না।

আলাউদ্দিনের আক্রমণের পর তিনশত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, এবার কিন্তু এই তিনশত বৎসরের অভিজ্ঞতা লইয়া মারাঠাজাতি অনেকটা জাগিয়া উঠিয়াছে। তুর্কী ও আফগান প্রভুদিগের অধীনতায় তাহাদিগের শিক্ষা প্রতিহত হয় নাই; ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম্ম, রাজনীতি কোনদিকেই উন্নতির ব্যাঘাত ঘটে নাই। এমন কি, দরবারেও আদালতেও মারাঠা ভাষা চলিত।

বীজ

(২)

নানা অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে মহারাষ্ট্রদেশ স্বাধীনতার ক্ষেত্র হইয়া গড়িয়া উঠিতেছিল। এই ক্ষেত্রে রাজা শিবাজী কেমন করিয়া স্বাধীনতার বীজ বপন করেন, আমরা তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

মুসলমান ইতিহাস-লেখকেরা শিবাজীকে লুণ্ঠনকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য পক্ষে, মহারাষ্ট্র-দেশীয় বখর-প্রণেতারা বলেন, শিবাজী ভগবানের অবতার, ধরার ভার হরণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বখর-লেখকেরা মহাত্মা শিবাজীকে অবতার বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্য অনেক শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। শিবাজী দস্যুও নহেন, অবতারও নহেন। তিনি সাহজী ও জীজাবাইয়ের পুত্র। তাঁহারা দুই জনেই বীরপুত্র শিবাজীর উপযুক্ত জনকজননী। ভাগ্যবানেরাই এমন জনক-জননী লাভ করেন। শিবাজীর পিতৃমাতৃ দুই কুলই মহারাষ্ট্র-দেশে বীর বংশ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

সমস্ত ঐতিহাসিকেরাই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, শিবাজী শৈশবে রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যান শুনিয়া অপরিসীম আনন্দ লাভ করিতেন। "কথকতা" শুনিবার জন্য তিনি বহুদূরবর্ত্তী স্থানে যাইতেন। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল; সম্পদে বিপদে সর্ব্বসময়ে তিনি ধর্ম্মরক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত শক্তি, সমুস্ত আশা, ধর্ম্মের উৎস

হইতে উৎসারিত হইত বলিয়াই কিছুকে তিনি অসম্ভব বলিয়া মনে করিতেন না। সংসারের হিসাবী লোকের ন্যায় তিনি লাভালাভ, সুখদুঃখ, সম্পদ্ বিপদ্ বিবেচনা করিয়া কাজ করিতেন না। জীবনের প্রথমাংশে তিনি তাঁহার ধর্ম্মবল সম্পূর্ণ-রূপে অনুভব করিতে পারেন নাই; এই অংশে তাঁহার দুই একটা কার্য্যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যাইতে পারে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি এক বিশেষ কার্য্য সাধনের জন্য জন্মিয়াছেন। এইরূপ কথিত আছে যে, মুক্তি-লাভের আশায় তিনবার তিনি সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন; শিক্ষক ও অভিভাবকেরা নানারূপ কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়াছিলেন।

শিবাজীর জীবনে বহু পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছে; ঐ সকল সঙ্কটের দিনে তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণে একটুমাত্র ভুল করিলেই হয়তো চিরদিনের জন্য তাঁহার জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইত। ঐ সকল পরীক্ষার দিনে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া ভগবানের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন; সাধু-দিগের মুখে ভগবানের আদেশ শুনিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতেন। শিবাজীর উল্লিখিতরূপে ভগবানে আত্মসমর্পণের কথা শুনিলে স্পষ্টই মনে হয় যে, তিনি কোন সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক আদর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন না।

বিদেশী ইতিহাস-লেখকেরা শিবাজীর চরিত্রের এই ধর্ম্ম-প্রাণতা একেবারেই বুঝিতে পারেন নাই, অথচ তাঁহার অপর সকল গুণ এইটির তুলনায় অতি নগণ্য ছিল, এবং এই ধর্ম্মপ্রাণতাই

তাঁহাকে তৎকালের পুরুষশ্রেষ্ঠ করিয়া দিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে তিনশত বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে যে ধর্ম্মান্দোলন চলিয়াছিল তাহা লোকের মনের উপর কার্য্য করিয়াছে। লোকে বুঝিয়াছে, ভগবানের সিংহাসনের সম্মুখে উচ্চনীচে প্রভেদ নাই, ও মুক্তি-লাভে সকলের সমান অধিকার রহিয়াছে। রামানন্দ, কবীর, রামদাস, রোহিদাস, শূরদাস, নানক ও চৈতন্য ভারতবর্ষের নানা অংশে এই সত্যই প্রচার করিয়াছেন। এই তত্ত্ব মহারাষ্ট্র-বাসীদিগের মনে বিশেষভাবে কার্য্য করিয়াছিল। তুকারাম, রামদাস, একনাথ ও জয়রামস্বামী মহারাষ্ট্রে এই সাম্যনীতি ঘোষণা করিয়াছেন। অওরঙ্গজেব যখন ধর্ম্মান্ধ হইয়া হিন্দু-প্রজাদিগের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করেন, তখন তাঁহার অধীন এক হিন্দুরাজা তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—"ভগবান্ কেবল মুসলমানদিগের ভগবান্ নহেন; তিনি সমগ্র মানব-জাতির ভগবান্। তাঁহার চক্ষে মূর্ত্তিপূজক ও মুসলমান দুই-ই তুল্য। হিন্দুদিগের ধর্ম্মাচরণে ব্যাঘাত সাধন করিলে ঈশ্বরের ইচ্ছা লঙ্ঘন করা হইবে।" এই কথা একজনের বটে, কিন্তু ইহা সমগ্র সমাজের কথা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই ভাবেরদ্বারা প্রণোদিত হইয়াই আবুলফজল এবং ফৈজি মহাভারত ও রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছিলেন, আকবর হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের মিলন ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সম্রাট্ সাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশেকো উপনিষৎ ও গীতার অনুবাদ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের গোঁড়ামি লোকের মন হইতে ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছিল।

ধর্ম্মের আলোক যে দেশে আসিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। লোকে পশুবলের নিকট মাথা নোয়াইতে চাহিত না, এবং ধর্ম্মের গোঁড়ামিকে ঘৃণা করিত। দেশের এইরূপ অবস্থায় মহারাষ্ট্র দেশে মোগলদিগের বলাভিমান ও অওরঙ্গজেবের ধর্ম্মের গোঁড়ামি ক্রমাগত অত্যাচার করিতে লাগিল। তুলজাপুর ও কোলাপুরের ভবানীমন্দিরের পুরোহিতেরা দেশের এই দুর্গতি দেখিয়া উত্তেজিত হইলেন। তাঁহারা ভাট ও গায়ক পাঠাইয়া সমস্ত দেশে এই দুঃখের কাহিনী প্রচার করিতে লাগিলেন।

শিবাজী দেশের এই দুর্গতি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি এই ধর্ম্মের গোঁড়ামি ও পশুবলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। সমস্ত মহারাষ্ট্রদেশ সমবেত হইয়া না উঠিলে যে এই বিপদে রক্ষা নাই তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়াই সমস্ত দেশের ঐক্য-সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য স্থাপন শিবাজীর লক্ষ্য, ধর্ম্মই তাঁহার প্রধান অস্ত্র। এই লক্ষ্য সাধনের জন্য তিনি স্বার্থ ও ভোগসুখ বিসর্জ্জন করিয়া বিপদকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার এই মহৎ লক্ষ্যের পথে যিনি অন্তরায় হইতেন, তিনি শত্রু হউন, মিত্র হউন, হিন্দু হউন, মুসলমান হউন, শিবাজী তাহার বিরুদ্ধেই অস্ত্রধারণ করিতেন।

সর্ব্বদেশের নায়কদিগের ন্যায় মহাত্মা শিবাজীরও একটি অপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তি ছিল। দেশের সমস্ত ধনবল, জনবল, বুদ্ধিবল তিনি আপনার চতুর্দ্দিকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিলেন। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলে তাঁহার পতাকামূলে

সমবেত হইয়াছিল। দেশের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোকের মধ্য হইতে তিনি তাঁহার মন্ত্রীদিগকে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। নিতান্ত নিৰ্জ্জীব প্রাণেও তিনি আগুন জ্বালাইয়া দিতে পারিতেন। শিবাজীর সৈন্যদলে মুসলমানেরাও কার্য্য করিত।

শিবাজীর অসামান্য আত্মসংযম ও সমরনৈপুণ্য ছিল। অর্থাভাবে অথবা যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার সৈন্যেরা সময় সময় গর্হিত কাজ করিত বটে, কিন্তু তাহারা কখনো গরু, নারী ও কৃষকদিগের উপর অত্যাচার করে নাই। শিবাজী নারীজাতিকে যেরূপ সম্মান দেখাইতেন, তাঁহার শত্রুরা তাহা কল্পনায়ও আনিতে পারিত না। যুদ্ধে ধৃত নারীদিগকে তিনি যথাবিহিত সম্মান দেখাইয়া তাহাদিগের স্বামীদের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। বস্তুতঃ, অসামান্য ধর্ম্মানুরাগ, দূরদর্শিতা ও প্রতিভার বল শিবাজীকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল।

অঙ্কুর

শিবাজী মহারাষ্ট্রদেশে স্বাধীনতার যে বীজ বপন করিয়াছিলেন কেমন করিয়া তাহা অঙ্কুরিত হইল ? কোথা হইতে রস আকর্ষণ করিয়া সে বীজ বাড়িয়া উঠিয়াছিল ? বহু শতাব্দীর সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন মহারাষ্ট্রদেশকে স্বাধীনতার উপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিণত করিলেও মহাত্মা শিবাজী যোগ্য সহযোগীর সহায়তা না পাইলে দেশে ঐক্যস্থাপন করিতে পারিতেন না।

যাঁহাদের আনুকূল্যে শিবাজীর উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল, তন্মধ্যে তাঁহার বীরজননী জীজাবাই সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিতে পারেন। এই নারী মহারাষ্ট্রদেশের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যাদববংশীয় এক গর্ব্বিত জায়গীরদারের কন্যা। শাহজীর সহিত তাঁহার যেমন করিয়া বিবাহ হয়, সে আখ্যান কতকটা উপন্যাসের মত। একদা তাঁহার পিতা অসতর্কভাবে এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, তাঁহার কন্যা শাহজীর পত্নী হইবে। শাহজীর পিতা মালোজী বলপূর্ব্বক এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। মালোজীর যথেষ্ট ধনবল ও জনবল না থাকিলেও তিনি বিশসহস্র সৈন্যের নায়ক যাদব রাওকে বুদ্ধিবলে পরাস্ত করিয়াছিলেন। পরাজিত যাদব রাও মালোজীর এই দুর্ব্যবহার কদাচ বিস্মৃত হন নাই। শাহজী অত্যন্ত পরাক্রমশালী ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। বিজাপুর ও আমেদনগরে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদস্থ ব্যক্তি বলিয়া সম্মান লাভ করেন। রাজারা তাঁহার হাতের

পুতুল হইলেন। জামাতার এইরূপ ক্ষমতা শ্বশুরের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রুদ্ধ ও অপমানিত যাদব রাও মোগল সম্রাটের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্বশুরের ষড়যন্ত্রে শাহজীকে বাধ্য হইয়া আমেদনগর হইতে পলায়ন করিয়া বিজাপুর যাইতে হয়। পথিমধ্যে যাদব রাওকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিপন্ন শাহজী গর্ভিণী পত্নী জীজাবাইকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে বাধ্য হন। জীজা পিতার হস্তে বন্দিনী হইয়া সিউনেরী দুর্গে বাস করিতে থাকেন। এই বিপদ্‌কালে দুর্গমধ্যে শিবাজীর জন্ম হয়। ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে বৈশাখী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে বৃহস্পতিবার তিনি ভূমিষ্ঠ হন। দুর্গাধিষ্ঠাত্রী শিবাই দেবীর নামানুসারে জননী পুত্রের নামকরণ করেন। স্বামীকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা বন্দিনী জীজাবাই এই সময়ে পরাধীনতার দুঃসহ ক্লেশ অনুভব করিতেছিলেন। নবজাত শিশু পুত্রটি তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনার স্থল ছিল। ভগবতী ভবানী দেবীর নিকট তিনি নিয়ত পুত্রের মঙ্গল কামনা করিতেন।

ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে জীজাবাই পুত্রসহ মুক্তিলাভ করিয়া শাহজীর সহিত মিলিত হন। শাহজীর আদেশক্রমে তিনি শিবাজীকে লইয়া পুণায় বাস করিতে থাকেন। মাতার প্রতি শিবাজীর অসীম ভালবাসা ছিল। তিনি কখন পিতার সহিত একত্র বাস করেন নাই; কিন্তু জননী তাঁহার চিরসঙ্গিনী ছিলেন। রক্ষাকর্ত্রী দেবীর ন্যায় তিনি চিরকাল পুত্রকে পালন করিয়াছেন। জননীর আদেশ লইয়া শিবাজী যখন কার্য্য করিতে যাইতেন, তখন কিছুতেই তাঁহার হৃদয় দমিয়া যাইত না। জননীর চরিত্র

হইতে শিবাজী তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ এবং আপন উচ্চ লক্ষ্যের প্রতি অচল বিশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন। জননী পৌরাণিক বীরগণের কীর্ত্তিকথা শুনাইয়া বালকের হৃদয়ে ধর্ম্মপিপাসা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিতেন। শাহজীর মৃত্যুকালে জীজাবাই স্বামীর সহিত সহমৃতা হইতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। কিন্তু পুত্রের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাঁহাকে সে কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয়। শিবাজী যখন দিল্লীতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার রাজ্যের ভার জননীর উপর রাখিয়া যান। জীবনের সঙ্কট সময়ে শিবাজী সর্ব্বদাই তাঁহার জননীর আশীর্ব্বাদ লইয়া কার্য্য করিতে যাইতেন। বীরজননী কখনও তাঁহার পুত্রকে কোন বিপজ্জনক কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতেন না, পরন্তু ভগবানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বিপদের সম্মুখীন হইতেই উপদেশ দিতেন। জীজাবাই শিবাজীর চরিত্রবলের প্রধান আশ্রয় ছিলেন। অন্যান্য মহাপুরুষদিগের ন্যায় তিনিও তাঁহার জননীর নিকট এই জন্য অশেষ ঋণী।

শিবাজীর শিশুচরিত্রের উপর যাঁহাদের প্রভাব পড়িয়াছিল এবং যাঁহারা তাঁহার সহায় ছিলেন, তদীয় সুযোগ্য শৈশবশিক্ষক দাদোজী কোণ্ডদেব তাঁহাদিগের অন্যতম। পিতা শাহজী তাঁহাকে শিবাজীর অভিভাবক ও জায়গীরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। বালক শিবাজী পিতার সহিত একত্র বাস করেন নাই বলিয়া যে-পিতৃস্নেহে বঞ্চিত ছিলেন, বৃদ্ধ দাদোজীর অযাচিত ভালবাসা তাঁহার সেই অভাব পূরণ করিয়া দিয়াছিল। বৃদ্ধ দাদোজী স্বভাবতঃই অতি গম্ভীর-প্রকৃতি ও হিসাবী ব্যক্তি ছিলেন। প্রথম

প্রথম তিনি বালক শিবাজীর স্বাধীন নির্ভীক ভাব পছন্দ করিতেন না। শিবাজীকে উচ্ছৃঙ্খল বালক মনে করিলেও বৃদ্ধের কোমল হৃদয় তাঁহাকে স্নেহদানে কদাচ বিমুখ হয় নাই, এবং অবশেষে তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, এই বীর শিশুকে সামান্য বালক বলিয়া গণ্য করা চলে না।

এ কথা অনেকেই স্বীকার করেন যে, শিবাজীর বাল্য-কালের উচ্ছৃঙ্খল ভাব সংযত করিবার জন্য একজন সুদক্ষ কঠোর শিক্ষকের আবশ্যক ছিল। দাদোজী এইরূপ উপযুক্ত শিক্ষক ছিলেন। তিনি তাঁহার শিষ্যকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেন। অসংযত সৈন্যদলকে বাধ্য করিয়া কেমন করিয়া একটা দল গড়িয়া তুলিতে হয়, শিবাজী দাদোজীর কাছেই সে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। রাজ্যপরিচালনকৌশলে দাদোজী সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন। তিনি যে জায়গীরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন, দুর্ভিক্ষে এবং বিজাপুর ও মোগল সৈন্যদিগের আক্রমণে সেই দেশ জনশূন্য ছিল। ব্যাঘ্রভীতি ও দস্যুর ভয়ে সে দেশে কৃষিকার্য্য বন্ধ ছিল। শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াই তিনি সুকৌশলে অল্পকালমধ্যে ব্যাঘ্র ও দস্যুভয় দূর করিয়া কৃষকদিগের নিকট ভূমি পত্তন করিয়া দিলেন। দশবৎসর-মধ্যে তিনি তাঁহার শাসনাধীন প্রদেশটিকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তোলেন। এই প্রদেশের শৈলদুর্গগুলি সংস্কার করিয়া তিনি সেগুলিতে বহুসংখ্যক সৈন্য রাখিলেন। সমস্ত প্রদেশে তিনি অসংখ্য ফলবান্ বৃক্ষ রোপণ করিয়া দিয়াছিলেন। ফলফুলে সুশোভিত বৃক্ষপূর্ণ গ্রামগুলি মনোহর শ্রী ধারণ করিয়াছিল।

দাদোজী কেমন ধর্ম্মপ্রাণ সংযমী পুরুষ ছিলেন, তাঁহার জীবনের একটী ক্ষুদ্র ঘটনায় তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইবে

একদিন তিনি প্রভুর বাগান হইতে তাঁহার বিনা অনুমতিতে একটী ফল লইয়াছিলেন। ফলটী হাতে লইয়াই তাঁহার মনে হইল প্রভুর বিনা অনুমতিতে ফল ছিঁড়িয়া তিনি গুরুতর পাপ করিয়াছেন। এই ভাবিয়া নিকটবর্ত্তী লোকদিগকে ডাকিয়া তিনি দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলিতে বলেন। লোকগুলি তাঁহার এই অনুরোধে বিস্মিত হইয়া গেল, তাহারা কিছুতেই তাঁহার এই অনুরোধরক্ষায় সম্মত হইল না। বহুলোকের অনুরোধে তিনি হাত কাটিয়া ফেলিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার দুষ্কার্য্য স্মরণ রাখিবার জন্য ঐ হাতখানি সর্ব্বদা অনাবৃত রাখিতেন। দীর্ঘকাল পরে শাহজীর আদেশে তিনি এই কঠোরতাও ত্যাগ করিয়াছিলেন।

দাদোজী ধার্ম্মিক ও শীলবান্ ছিলেন। শিবাজীর উচ্চাভিলাষ তিনি কখনো সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তিনি মনে করিতেন, শিবাজী একজন বড় জায়গীরদার হইবেন। প্রতিদ্বন্দ্বী মহারাষ্ট্রদেশনায়কেরা তাঁহাকে ক্ষমতাশালী বলিয়া ভয় করিতেন। কিন্তু শিবাজীর প্রাণ যে দেশের সমস্ত দ্বন্দ্ব, অনৈক্য দূর করিয়া দিয়া এক ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, বৃদ্ধ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। মৃত্যুর পূর্ব্বে যখন তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্রাধিক শিষ্যের এত বড় সঙ্কল্প সাধনের শক্তি আছে, তখন তিনি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। দাদোজীর শাসন-বিভাগ ও রাজস্ব-

বিভাগের আদর্শে শিবাজী আপনার রাজ্যের শাসন ও রাজস্ব বিভাগ গঠন করিয়াছিলেন। দাদোজীর ন্যায় একজন উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট সংযম ও যুদ্ধাদি বিদ্যা শিক্ষা না পাইলে শিবাজীর বাল্যকালের উচ্ছৃঙ্খলতা খর্ব্ব হইত না এবং তাঁহার জীবনে সফলতালাভের ব্যাঘাত ঘটিত।

যাঁহারা ধর্ম্মের তেজ সঞ্চার করিয়া দিয়া মহারাষ্ট্র দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনকে প্রাণবান্ করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সকলের জীবনী আলোচনা এস্থলে অসম্ভব। শিবাজীর দীক্ষাগুরু সুপ্রসিদ্ধ রামদাস স্বামী ইহাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি শিবাজীর ধর্ম্মসাধনায় ও রাজনীতিক্ষেত্রে বিশেষ সহায় ছিলেন। গুরু রামদাস স্বামীর প্রভাব শিবাজীর জীবনে কতখানি কার্য্য করিয়াছিল, কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিলে তাহা বেশ বুঝা যাইবে।

রামদাস স্বামীর আদেশে শিবাজী বৈরাগীর উত্তরীয়কে জাতীয় পতাকা করেন, মুসলমানী প্রণাম-পদ্ধতি উঠাইয়া দেন, রাষ্ট্রের কর্ম্মচারীদের মুসলমানী নাম তুলিয়া দিয়া সংস্কৃত নাম রাখেন। গুরু রামদাস স্বামী শিবাজীকে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে উৎসাহ দিতেন। একবার শিবাজী তাঁহার গুরুকে কিছু ভূমি দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গুরু বলিলেন—"দেশের যে যে স্থানগুলি এখনো মুসলমানদের অধীন আছে, সেইগুলি আমাকে দান কর।" কথাটার তাৎপর্য্য এই যে, মুসলমানের হাত হইতে এখনো তুমি তোমার সমস্ত স্বদেশ উদ্ধার করিতে পার নাই। এইরূপ প্রকাশ যে, গুরুকে শিবাজী একদিন

রামদাস স্বামী

তাঁহার সমস্ত রাজ্য দান করিয়াছিলেন। ভিক্ষুক রামদাস রাজ্য লইয়া কি করিবেন? তিনি শিবাজীকে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে নিষ্কামভাবে রাজ্য শাসন করিতে আদেশ করেন।

রামদাস স্বামী যেমন তেমন লোক ছিলেন না। বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মের উপর তাঁহার আন্তরিক টান ছিল। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে গোদাবরী নদীর তীরবর্ত্তী জাম্বগ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। পিতামাতা তাঁহার 'নারায়ণ' নাম রাখিয়াছিলেন।

স্বদেশের ও ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিবার নিমিত্ত তিনি চিরকুমার-ব্রত গ্রহণ করেন। মরণকালপর্য্যন্ত তিনি লোকের কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার খ্যাতি শুনিয়া শিবাজী তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করেন। তেজস্বী শিবাজী উপযুক্ত গুরু লাভ করিয়া ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

রামদাস স্বামী অতি উদারপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি মুসলমান শাসন-প্রণালার ঘোর বিরোধী হইয়াও, মুসলমান ধর্ম্মকে বিন্দুমাত্রও ঘৃণা করিতেন না। জীবনের শেষভাগে তিনি সজ্জনগড়ে বাস করিতেন; সেখানে দুর্গমধ্যে হিন্দুর সমাধির নিকটে অনেকগুলি মুসলমানের কবর ছিল। গোঁড়া মুসলমানেরা যেমন হিন্দুর সমাধি ভাঙ্গিয়া ফেলিত, তিনি তেমন করিয়া মুসলমানদের কবরগুলি নষ্ট করেন নাই।

১৬৮১ খৃষ্টাব্দে, শিবাজীর মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পরে, সজ্জনগড়ে তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন।

রাজনীতিক্ষেত্রে শিবাজী অনেক বুদ্ধিমান্ ও অনুরক্ত

সহকারী পাইয়াছিলেন। শিবাজীর উপর তাঁহাদের এমন টান ছিল যে, তাঁহার ইঙ্গিতে অবলীলাক্রমে তাঁহারা জীবন পর্য্যন্ত দিতে পারিতেন। চুম্বক যেমন করিয়া লোহাকে আকর্ষণ করে, শিবাজী তেমন করিয়া সমগ্র মহারাষ্ট্র দেশের জনবল, ধনবল, বুদ্ধিবল আপনার চতুর্দ্দিকে সমবেত করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শিবাজীর সহকারীদিগের মধ্যে একজনও বিপদে সম্পদে তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই; কেহ কদাচ বিশ্বাস-ঘাতকতা বা শত্রুদলে যোগদান করিয়া শিবাজীর অনিষ্ট সাধন করেন নাই। শিবাজী তাঁহাদিগকে যে কাজে নিযুক্ত করিতেন, অনেকেই মৃত্যু পর্য্যন্ত সেই কাজ করিয়াছেন। নেতার প্রতি এবং মহৎলক্ষ্যের প্রতি তাঁহাদের এই আন্তরিক নিষ্ঠাই মহারাষ্ট্র-জাতির স্বাধীনতা লাভের কারণ।

শিবাজীর সহযোগীদের মধ্যে মোরেপন্ত পিঙ্গলে, আবাজী সোনদেব, যেসাজী কঙ্ক, রঘুনাথ বল্লাল, শ্যামরাজ পন্ত, বৃদ্ধ পিঙ্গলে (মোরোপন্তের পিতা), অন্নাজী দত্তো, নিরাজী পণ্ডিত, রঘুনাথ পন্ত, বাওজী সোমনাথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্বদেশসেবক-দিগের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মোরেপন্ত পিঙ্গলে শিবাজীর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। তিনি কোঙ্কণ ও বাগলন প্রদেশে রাজ্যবিস্তার করিয়া পেশওয়েপদ লাভ করিয়াছিলেন। সৈন্যদলগঠনে ও দুর্গনির্ম্মাণে তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল। ১৬৫৩ অব্দে যুবাবয়সে তিনি শিবাজীর সৈন্যদলে প্রবেশ করেন। পেশওয়ে শ্যামরাজপন্ত যখন কোঙ্কণ প্রদেশে সিদ্দিদের সহিত যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইতে

ছিলেন, তখন শিবাজী মোরেপন্তকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন। মোরেপন্ত যুদ্ধে বিজয়ী হন। পিঙ্গলে শিবাজীর সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি ও উপদেষ্টা ছিলেন। শিবাজীর সহচরগণের মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা স্বদেশানুরাগী বীর বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

আবাজী সোনদেবও পিঙ্গলের ন্যায় সেনানায়ক ছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে কল্যাণ জয় করিয়া জায়গীরের সীমার বাহিরে রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি কোঙ্কণের সুবাদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মোরেপন্তের ন্যায় তিনিও দুর্গনির্ম্মাণে সুপণ্ডিত ছিলেন। শিবাজী যখন দিল্লীতে গমন করেন তখন মোরেপন্ত ও আবাজী সোনদেব জননী জীজাবাইর প্রধান উপদেষ্টা থাকিয়া রাজ্যচালনা করিতেন। আবাজী সর্ব্বপ্রথমে "মজুমদারের" পদ লাভ করেন। শিবাজীর অভিষেকসময়ে তাঁহার পুত্র অমাত্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

অন্নাজী দত্তোও একজন প্রসিদ্ধ নায়ক ছিলেন। শিবাজীর অভিষেকসময়ে তিনি "পন্ত সচিব" নিযুক্ত হন। বহুযুদ্ধে যোগদান করিয়া তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। দক্ষিণ কোঙ্কণ তাঁহার শাসনাধীন ছিল। শিবাজীর দিল্লী গমন সময়ে অন্নাজীও দেশ রক্ষার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দত্তাজী গোপীনাথ মন্ত্রীর কার্য্য করিতেন। শিবাজী যখন আফ্জল খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন ইনি তাঁহার সঙ্গী ছিলেন।

নিরাজী রাওজি ন্যায়াধীশের কার্য্য করিতেন। মুরার বাজি

পুরন্দর দুর্গের রক্ষক ছিলেন। তিনি দিলির খাঁর সহিত যুদ্ধ করিয়া অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ কবিয়াছিলেন; যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াও দুর্গরক্ষা করিয়া কীর্ত্তি লাভ করেন। ইনি একজন কায়স্থ-সেনানায়ক ছিলেন। কায়স্থ সেনানায়কদিগের মধ্যে মুরার বাজি, বাজিপ্রভু ও বালাজী আবাজী বিখ্যাত। বাজি-প্রভু প্রথমে শিবাজীর বিপক্ষে ছিলেন, পরে তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত হইয়া উঠেন। তিনি রাঙ্গানা গিরিসঙ্কটে এক সহস্র সৈন্য লইয়া বিজাপুরের অগণ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন। সেই যুদ্ধে তিনি যে বীরত্ব প্রদর্শন করেন, তাহা অবর্ণনীয়। কেহ কেহ রাঙ্গানা গিরিসঙ্কটের যুদ্ধের সহিত থার্ম্মপলি যুদ্ধের তুলনা করিয়া থাকেন।

বালাজী আবাজীর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হইয়া শিবাজী তাঁহাকে প্রধান অমাত্যপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

শিবাজী তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের প্রথমাংশে মাওলী সৈন্যদল গঠন করেন। এই সৈন্যদলের নায়ক যেসাজী কঙ্ক ও তানাজি তাঁহার চির সহচর ছিলেন। তাঁহাদিগকে শিবাজীর ছায়া বলা যাইতে পারে। আফ্‌জল খাঁর হত্যার সময়ে, সায়েস্তা খাঁকে আক্রমণকালে, দিল্লী গমন সময়ে,—তাঁহারা দুইজনেই শিবাজীর সঙ্গী ছিলেন।

কর্ম্মক্ষেত্রে শিবাজী

জননী জীজাবাই ও দাদোজী কোণ্ডদেবের নিকট বীরোচিত সুশিক্ষা পাইয়া বালক শিবাজীর হৃদয় হইতে জাতির ও ধনের অভিমান দূর হইয়াছিল। তিনি পুণায় থাকিয়া প্রতিবেশী নিম্নশ্রেণী মাওলীদের সহিত বন্ধুভাবে মিলিতে আরম্ভ করেন। মাওলীগণ প্রায়ই পরস্পর বিবাদ করিত। শিবাজীর সহৃদয় ব্যবহারে তাহারা বিবাদ ভুলিয়া অবিচ্ছিন্ন হইয়া উঠিল। শিবাজীর চরিত্রপ্রভাবে ও অদম্য চেষ্টার ফলে অরণ্যবাসী অসভ্য মাওলীগণ কষ্টসহিষ্ণু, যুদ্ধকুশল ও শিক্ষিত সৈন্যরূপে পরিণত হইল। তিনি তাঁহার এই অনুরক্ত মাওলী সৈন্যদের সহিত ঘাটমাথা ও কোঙ্কণের অরণ্যে, পর্ব্বতে ও গিরিসঙ্কটে মৃগয়া করিয়া বেড়াইতেন। এইরূপে এই সকল স্থানের গিরি-নদী, দুর্গম-সুগম সর্ব্বস্থান তাঁহার সুবিদিত হইয়া গেল।

একদল সুশিক্ষিত সৈন্যের নায়ক হইয়া অল্পবয়সেই শিবাজীর মনে একটি নূতন রাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। শিবাজী দেখিলেন, তাঁহার পিতার বিস্তৃত জায়গীরের মধ্যে একটিও দুর্গ নাই। তিনি আত্মরক্ষার নিমিত্ত দুর্গ নির্ম্মাণ ও অধিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তরুণবয়স্ক শিবাজী নিভৃতে একদল সৈন্য গঠন করিয়া সহসা ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে কর্ম্মক্ষেত্রে বাহির হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে

বিজাপুররাজ কর্ণাটযুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন; সুযোগ পাইয়া শিবাজী নিকটবর্ত্তী তোরণা দুর্গ অধিকার করিবার উদ্‌যোগ করেন। দুর্গটি পুণা নগরের দক্ষিণপশ্চিমে নয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। দুর্গের প্রধান কর্ম্মচারীকে শিবাজী অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া একদিন রাত্রিকালে মাওলী সৈন্যসহ দুর্গ অধিকার করেন। এইরূপে বিনা রক্তপাতে তিনি তোরণা জয় করিলেন।

তোরণাদুর্গ জয় করিবার পূর্ব্বে শিবাজী সাধারণের নিকট অপরিচিত ছিলেন। এই ঘটনার পর তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল।

শিবাজী অত্যল্পকালমধ্যে নবাধিকৃত দুর্গটি সুন্দররূপে সংস্কার করিয়া ফেলিলেন। তোরণাদুর্গ হইতে দুই মাইল দূরে মুরাবাদ নামক একটি পর্ব্বত আছে। শিবাজী এই পর্ব্বতোপরি একটি সুরক্ষিত দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। শত্রুর অভেদ্য এই দুর্গটিই রায়গড় নামে খ্যাত। রায়গড়ই এখন হইতে শিবাজীর প্রধান বাসস্থান হইল।

পিতা শাহজী পুত্রের দুঃসাহসিক কার্য্যের সংবাদ অবগত হইয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহাকে এরূপ কার্য্য হইতে বিরত হইবার নিমিত্ত ভৎর্সনা করিয়া পত্র লিখিলেন। দাদোজী শিষ্যের বীরত্বে ও বুদ্ধিতে সন্তুষ্ট হইলেও শাহজীর অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া শিবাজীকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলেন। যখন শিবাজী উল্লিখিতরূপে ধীরে ধীরে কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিতেছেন, তখন তাঁহার বীর গুরু দাদোজীর মৃত্যু হয় (১৬৪৭ খৃঃ)। মৃত্যুশয্যায় তিনি তাঁহার প্রতিভাশালী প্রিয়

শিষ্যের জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

দাদোজীর মৃত্যুর পর পৈতৃক জায়গীর রক্ষার ভার শিবাজীর উপর পড়িল। পিতার আদেশে তিনি জায়গীর রক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। পূর্ব্ব হইতেই স্বদেশবাসীদিগকে ধর্ম্মান্ধতা ও পরাধীনতার উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার বাসনা তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়াছিল, এক্ষণে দিন দিন ঐ চিন্তা বাড়িতে লাগিল। শিবাজীর জীবনের এই মঙ্গল উদ্দেশ্য ক্রমশঃ মহারাষ্ট্র দেশের নায়কগণ বুঝিতে লাগিলেন। চাকন দুর্গের হাবিলদার ফিরঙ্গোজী নরসালা স্বদেশের কল্যাণকল্পে তাঁহার হস্তে আপন দুর্গ অর্পণ করিয়া শিবাজীর সহচর হইলেন। শিবাজী চাকন দুর্গ যুদ্ধোপকরণে পূর্ণ করিয়া ফিরঙ্গোজীকেই দুর্গরক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত করেন।

ক্রমশঃ শিবাজীর জায়গীর পুণা, সুপা, বারামতী ও ইন্দাপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। এই সমস্ত প্রদেশের অধিবাসীরা মাওলী। অধিকাংশ মাওলী শিবাজীর শাসনাধীন হইল। তিনি মাওলী নায়কদিগের অধীনে সৈন্যদল গঠন করিয়া ক্রমশঃ বিক্রমশালী হইতে লাগিলেন।

মাওলী সেনানায়ক তানাজী শিবাজীর শৌর্য্যবীর্য্য ও স্বদেশ-হিতৈষিতায় মোহিত হন। তাঁহার উৎসাহে শিবাজী এই সময়ে "কোণ্ডানা" দুর্গ অধিকার করিতে উদ্‌যোগী হন। অসম-সাহসিক তানাজী মাওলী সৈন্যসহ একদা গভীর রাত্রিকালে অতর্কিতভাবে দুর্গ আক্রমণ করেন। নিদ্রিত ও নিশ্চিন্ত

মুসলমান সৈন্যগণ সহসা আক্রান্ত হইয়া পরাজিত হয়। নবাধিকৃত কোণ্ডানা দুর্গের নাম বদ্‌লাইয়া "সিংহগড়" করা হইল। শিবাজী তানাজীকে এই গড়ের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন।

বিনা রক্তপাতে শিবাজী পূর্ব্বোক্ত স্থান ও দুর্গগুলি অধিকার করেন। কিন্তু বিনা যুদ্ধে এবং অল্পচেষ্টায় তিনি যে হিন্দু রাজ্য স্থাপন করিতে পারিবেন না, কর্ম্মক্ষেত্রে নামিবার পূর্ব্বেই তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের সহিত তাঁহাকে শীঘ্রই প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ করিতে হইবে, তিনি তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া তাঁহার মাওলী সৈন্যদিগকে সর্ব্বদা যুদ্ধসজ্জায় সুসজ্জিত থাকিতে উপদেশ দিলেন। সিংহগড়ে তিনি তিন সহস্র অশ্বারোহী ও দশ সহস্র পদাতিক মাওলী সৈন্য রাখিলেন।

শিবাজী যখন সিংহগড় অধিকার করিয়া মাতার সঙ্গে দেখা করিবার নিমিত্ত পুনায় গিয়াছিলেন, তখন তিনি শুনিতে পাইলেন যে পুরন্দর দুর্গের অধ্যক্ষ নীলকণ্ঠ রাওয়ের মৃত্যু হইয়াছে। বৃদ্ধের তিন পুত্র দুর্গের অধ্যক্ষ পদ পাইবার নিমিত্ত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া বিবাদ-মীমাংসার জন্য শিবাজীকে "মধ্যস্থ" মান্য করেন। শিবাজী তিন ভাইকে বন্দী করিয়া দুর্গ অধিকার করেন। ঐতিহাসিক গ্রাণ্ট্ ডফ্ শিবাজীর এই আচরণ উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া গালি দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকেও একথা স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, উক্ত তিন ভাই শিবাজীর অধীনে "ইনামভূমি" পাইয়া খ্যাতি লাভ

রিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রদেশের "বখর" প্রণেতারা বলেন যে,
স্থ সৈন্যদলের অনেকেই ভ্রাতৃত্রয়ের বিবাদ কোনকালে
টিবে না বলিয়া শিবাজীকে স্বহস্তে দুর্গের ভার গ্রহণ করিতে
নুরোধ করেন। ভাই তিনজনের মধ্যেও দুইজনে সৈন্যদের
তে মত দিয়াছিলেন। ইহা হইতে মনে হয় যে, শিবাজী
ধিকাংশের মতানুসারে স্বয়ং দুর্গের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। ইহা
ড়া আরো একটা কারণে শিবাজী স্বয়ং দুর্গ অধিকার
রিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি বিবাদ-রত তিন ভ্রাতার
াহাকেও দুর্গাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলে, অন্য কোন প্রবল ব্যক্তি
নায়াসে তাহার হাত হইতে দুর্গটি জয় করিয়া লইতে
ারিত। কিন্তু এই দুর্গটি শিবাজীর জায়গীরের নিকটে।
াত্মরক্ষায় অসমর্থ ব্যক্তির হাতে এই দুর্গের ভার দেওয়া
াহার পক্ষে রাজনীতি-সম্মত হইত বলিয়া মনে হয় না।

এইরূপে শিবাজী দুর্গের পর দুর্গ অধিকার করিয়া আপনার
নবল ও সৈন্যবল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। শিবাজী নিজ
ায়গীরের উন্নতিকল্পে এই সব কার্য্য করিতেছেন মনে করিয়া
াজাপুররাজ প্রথমে ইহার প্রতিবিধানের কোনো চেষ্টা করেন
াই। বিশেষতঃ, তিনি মনে করিতেন যে, তাঁহার একজন
াধান কর্ম্মচারীর পুত্র হইয়া শিবাজী কখনো তাঁহার বিরুদ্ধা-
রণ করিবেন না। তাহা ছাড়া শিবাজী যখন স্বীয় বাহুবলে নিজ
ায়গীর বাড়াইয়া তুলিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই বিজাপুর-
াজের পক্ষ হইয়া শাহজী কর্ণাটে যুদ্ধ করিতেছিলেন; শাহজীর
্দ্ধিবলে ও বীরত্বে সেখানে শত্রুরা পরাজিত ও বশীভূত

হইতেছিল। এমন সময়ে বিজাপুররাজ শাহজীর পুত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার অবসর পান নাই, হয়তো ব' আবশ্যক বলিয়াও মনে করেন নাই। শিবাজী নির্ব্বিবাদে পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলেন। শিবাজী ক্রমে এমন শক্তিলাভ করিলেন যে, তখন আর তিনি বিজাপুররাজের ভয়ে ভীত নহেন। বিজাপুররাজের সহিত প্রকাশ্যে যুদ্ধ করিবার উপযোগী জনবল ও ধনবল তিনি সঞ্চয় করিয়াছেন। ইতোমধ্যেই নেতাজী পালকর, ফিরঙ্গোজী নরসালা, তানাজী মালসুরে, মোরেপন্ত পিঙ্গলে প্রভৃতি স্বদেশভক্ত বীরগণকে শিবাজী আপন দলে পাইয়াছেন। বিজাপুররাজ শিবাজীর রাজ্য-বিস্তারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার পূর্ব্বেই তিনি অনন্য-সুলভ ক্ষিপ্রতাসহকারে কঙ্গুরি, টুঙ্গ, তিকোনা, ভোরপ, কোয়ারি, লোহগড়, রাজমাচি প্রভৃতি দুর্গগুলি জয় করেন। এদিকে তাঁহার অনুরক্ত বীরেরা তালা, ঘোসলা এবং রায়রী প্রভৃতি স্থান অধিকার করেন।

শিবাজীর সুযোগ্য সহযোগী, দাদোজী কোণ্ডদেবের শিষ্য আবাজী সোনদেব কল্যাণ আক্রমণ করেন। মুলানা আহমদ কল্যাণ নগরের শাসনকর্ত্তা। তিনি বিজাপুররাজের অধীনে কার্য্য করিতেছিলেন। সহসা আক্রান্ত হইয়া তিনি পরাজিত ও বন্দী হইলেন। সোনদেব কল্যাণ প্রদেশের সমস্ত দুর্গগুলি জয় করিয়া ফেলেন। শিবাজী কল্যাণ-বিজয়ের সংবাদে আশাতীত আনন্দলাভ করিয়া অবিলম্বে উক্ত প্রদেশে গমন করেন। তিনি আবাজী সোনদেবকে উক্ত প্রদেশের "সুবাদার" বা

শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। শিবাজী অল্পকালমধ্যে এই প্রদেশের রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়া প্রদেশটিতে শান্তি সংস্থাপন করেন। তাঁহার আদেশে এই সময়ে ঘোসালার নিকটে বীরওয়াড়ী ও রায়রির নিকটে লিঙ্গানা দুর্গ নির্ম্মিত হয়।

শিবাজীর বীরত্ব-কাহিনী শ্রবণ করিয়া বিজাপুররাজ মহম্মদ আদিল শাহ নিতান্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি মনে করিলেন, শিবাজী তাঁহার পিতার ইঙ্গিতে অবৈধ উপায়ে জায়গীর বাড়াইয়া তুলিতেছেন। শিবাজীর দর্প চূর্ণ করিবার মানসে তিনি কর্ণাটে শাহজীকে তিরস্কারপূর্ণ এক পত্র লিখিলেন। বিজাপুররাজকে শাহজী পত্রোত্তরে জানাইলেন যে, এই সব যুদ্ধব্যাপারে শাহজী লেশমাত্র লিপ্ত নহেন। শাহজীর পত্র পাইয়া মহম্মদ আদিল শাহের সন্দেহ দূর হইল না, বরং বাড়িয়া গেল। তিনি মনে করিলেন, শাহজী আত্মদোষ ক্ষালনের নিমিত্ত প্রতারণা করিতেছেন। তিনি শাহজীকে অতর্কিতভাবে বন্দী করিবার ইচ্ছা করিলেন। বাজী ঘোরফড়ে নামক শাহজীর এক বন্ধু বিজাপুররাজের চাকুরী করিতেন। মহম্মদ আদিল শাহ নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে বাধ্য করেন। ঘোরফড়ে বন্ধুকে স্বীয় ভবনে আহ্বান এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া বিজাপুররাজ-সমীপে প্রেরণ করিলেন।

মহম্মদ আদিল শাহ শাহজীকে একটি অপ্রশস্ত ঘরে আটক করিয়া তাঁহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন এবং প্রকাশ করিলেন যে, শিবাজী অবিলম্বে

তাঁহার রাজ্যাংশ ফিরাইয়া না দিলে আহার বন্ধ করিয়া দিয়া শাহজীকে মারিয়া ফেলিবেন।

শিবাজী বিপন্ন হইলেন। পিতার কারাবরোধের সংবাদে তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। এই দুর্দ্দিনে তাঁহার বীরপত্নী সইবাই তাঁহার হৃদয়ে নূতন বলের সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন। বীরনারী বলিয়াছিলেন—"পিতাকে উদ্ধার করা আপনার একান্ত কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু এই ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য পালনের জন্য আপনার উচ্চতর কর্ত্তব্য বিসর্জ্জন করা শ্রেয়ঃ কিনা, বিজ্ঞ মন্ত্রী-দিগের সহিত সে বিষয়ে পরামর্শ করুন। বিশ্বাসঘাতক আদিল শাহের বশ্যতা স্বীকার করিয়া আপনি নিজের শক্তি খর্ব্ব করিবেন না।"

বিজাপুররাজের সহিত এই সঙ্কটসময়ে সন্ধি ও যুদ্ধ দুইই বিপজ্জনক মনে করিয়া শিবাজী স্বীয় পত্নী ও মন্ত্রীদিগের মতানুসারে দিল্লীশ্বর শাহজাহানের সাহায্য-প্রার্থী হইলেন বলা বাহুল্য, এতদিন শিবাজী যে যে স্থান ও দুর্গ অধিকার করিয়াছেন তাহার কিছুই মোগল সম্রাটের রাজ্যভুক্ত নহে। রাজনীতিজ্ঞ শিবাজী একই সময়ে বিজাপুররাজ ও দিল্লীর সম্রাট দুইজনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন নাই।

সম্রাট্ শাহজাহান শিবাজীকে কি কি সর্ত্তে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন সেগুলি স্পষ্ট জানা যায় নাই। তবে ইহা নিশ্চিত যে, তিনি শাহজীর পূর্ব্বকৃত দুর্ব্যবহার ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার মোগল-রাজসরকারে চাকুরী দিতে এবং শিবাজীকে পাঁচ সহস্র সৈন্যের মন্‌সব্‌দার নিযুক্ত করিতে

স্বীকৃত হইয়াছিলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই মোগল সম্রাটের দূত শাহজীর মুক্তিপত্র-সহ বিজাপুর-রাজসমীপে গমন করেন। পুত্রের বুদ্ধিবলে শাহজী অচিরে মুক্তিলাভ করেন।

শাহজী কারাক্লেশ হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন বটে, কিন্তু আরো চারিবৎসরকাল তিনি বিজাপুররাজের নজরবন্দী হইয়া রহিলেন। পিতার অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া শিবাজী এই চারিবৎসরকাল দেশ-জয় কার্য্য হইতে কতকটা বিরত ছিলেন। শিবাজী বুদ্ধিকৌশলে আপনার সমস্ত অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পিতাকে কারামুক্ত ও মোগল-সম্রাটের সহায়তা লাভ করিলেন।

শিবাজী মোগল-সম্রাটের অধীনে মন্‌সব্‌দারী পদ গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, কিন্তু তিনি কোন কারণবশতঃ এই পদ গ্রহণ করেন নাই। এইরূপ প্রকাশ, শিবাজী যখন মোগল-সম্রাটের সাহায্যপ্রার্থী হন তখন তিনি সম্রাটের শাসনাধীন জুন্নর ও আমেদনগর—এই দুইটি জিলার উপর চৌথ ও সরদেশমুখী কর দাবী করিয়াছিলেন। শিবাজী বলেন, এই স্থান দুইটি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের অধিকারভুক্ত ছিল। সম্রাট্ শাহজাহান শিবাজীর এই দাবী অগ্রাহ্য না করিয়া তাঁহাকে দিল্লীনগরে উপস্থিত হইয়া নিজ দাবী সপ্রমাণ করিতে বলেন। সম্রাট্ শাহজাহানের জীবদ্দশায় শিবাজীর দিল্লী গমনের অবসর উপস্থিত হয় নাই, এবং তিনি মোগল-সম্রাটের অধীন মন্‌সব্‌দারীও গ্রহণ করেন নাই।

বিজাপুররাজের সহিত যুদ্ধ

(১৬৫১—৬২)

দশ বৎসরের কিছু অধিককাল বিজাপুররাজের সহিত শিবাজীর সংগ্রাম চলিয়াছিল। এই যুদ্ধের ফলে একদিকে যেমন শিবাজীর খ্যাতিপ্রতিপত্তি ও সাহসপরাক্রম বাড়িয়াছিল, অপরদিকে তেমন তাঁহার রাজ্যও অনেক পরিমাণে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

শিবাজীর পিতা কারাক্লেশ হইতে অব্যাহতি পাইয়া কর্ণাটে নিজ জায়গীরে যাইবার ইচ্ছা করিলেন। বিজাপুররাজ প্রথমে অনুমতি দিলেন না, কিন্তু অল্পকাল পরে কর্ণাটে এমন বিদ্রোহ উপস্থিত হইল যে, বিজাপুররাজ বাধ্য হইয়াই শাহজীকে সেখানে পাঠাইলেন।

কিন্তু বিজাপুররাজ ঘোরফড়ের জন্য চিন্তিত হইলেন। শাহজী তাহার কোন অনিষ্ট না করেন, এইজন্য তাঁহাকে কর্ণাটে পাঠাইবার পূর্ব্বে, তিনি কতকগুলি সর্ত্তে আবদ্ধ করিলেন। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করাইলে কি হইবে, শাহজী ঘোরফড়ের বিশ্বাস-ঘাতকতা কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না। তিনি নিজে তাহার কোন অনিষ্ট করিলেন না বটে, কিন্তু পুত্র শিবাজীকে লিখিলেন,—"তুমি যদি আমার পুত্র হও, বাজী ঘোরফড়েকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিও।" শিবাজী যথাসময়ে পিতার আদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে ত্রুটি করেন নাই। শাহজী বিজাপুররাজের দুর্ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া পুত্র

সম্ভাজীকে লইয়া বিদ্রোহদমনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি সম্ভাজীকে কনকগিরি দুর্গের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন। এইখানে কুচক্রীরা ষড়যন্ত্র করিয়া সম্ভাজীকে হত্যা করে। আফ্‌জল খাঁ নাকি এই হত্যার একজন পরামর্শদাতা ছিলেন। শাহজী বিজাপুর হইতে কর্ণাটে গমন করায় শিবাজী অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। সময় বুঝিয়া তিনি আবার ধীরে ধীরে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে তিনি সমগ্র ঘাটমাথা এবং কোঙ্কণ প্রদেশের মারাঠানায়কদিগকে স্বপক্ষে আনয়নের চেষ্টা করেন। ঐ দুই স্থানের নায়কেরা বিজাপুররাজের অধীন। শিবাজীর মহদুদ্দেশ্য না বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন।

জাওলির রাজা চন্দ্ররাও বিদ্রোহীদের অগ্রণী ছিলেন। ঘাটমাথা প্রদেশটার অধিকাংশই তাঁহার অধীন ছিল। শিবাজী তাঁহাকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য বিস্তর অনুনয় বিনয় করেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই শিবাজীর পক্ষে আসিলেন না। স্বপক্ষে আসা দূরের কথা, তিনি উল্টা চাল চালিতে লাগিলেন। শিবাজীকে প্রবল শত্রু মনে করিয়া তিনি তাঁহাকে দমন করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। এই সময়ে বিজাপুরের রাজা বাজীশ্যামরাজ নামক জনৈক ব্রাহ্মণসর্দ্দারের অধীনে একদল সৈন্য গোপনে শিবাজীর বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন। চন্দ্ররাও নিজ জায়গীরে ইহাদিগকে আশ্রয় দিয়া ইহাদের সহিত মিলিয়া শিবাজীকে গুপ্তভাবে হত্যা করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। চতুর শিবাজীর নিকট চন্দ্ররাওয়ের

সমস্ত চক্রান্ত প্রকাশিত হইয়া পড়িল। শিবাজী এই কুচক্রীদিগকে শাস্তি প্রদান করিতে সঙ্কল্প করিলেন। বাজী-শ্যামরাজ সহসা শিবাজীকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পরাজিত হন

চন্দ্ররাওকে দমন করিবার ভার রঘুনাথবল্লাল ও সম্ভাজী কাওজী নামক দুইজন বীর স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করেন তাঁহারা প্রথমে চন্দ্ররাওয়ের নিকট শিবাজীর ধর্ম্মরাজ স্থাপনের বাসনা ব্যক্ত করেন। জাওলিরাজ শিবাজীর মহৎ উদ্দেশ্যের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। অতঃপর চন্দ্র-রাওয়ের সহিত শিবাজীর বৈবাহিক সূত্রে মিলনের প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়, সে প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হইল। চন্দ্ররাওয়ের রাজ্য আক্রমণ ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই বুঝিয়া রঘুনাথবল্লাল ও সম্ভাজী কাওজী শিবাজীকে সসৈন্যে জাওলির সন্নিকটে আসিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে অনুরোধ করেন শিবাজী সসৈন্যে আগমন করিয়া জাওলির নিকটবর্ত্তী একটি গিরিপথে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে শিবাজীর সহযোগীরা গোপনে কৌশলে চন্দ্ররাও ও তাঁহার ভ্রাতা সূর্য্য রাওকে হত্যা করিয়া শিবাজীর সহিত মিলিত হইলেন অল্পদিনমধ্যে জাওলি অধিকৃত হইল। উক্ত প্রদেশের ওয়াসোটা ও অপর দুর্গগুলি শিবাজী অনায়াসে জয় করিয়া লইলেন। শিবাজী নবাধিকৃত ওয়াসোটা দুর্গের 'ব্যাঘ্রগড়' নামকরণ করিলেন।

গ্রাণ্ট ডফ্ প্রমুখ বৈদেশিক ইতিহাস-লেখকগণ চন্দ্ররাওয়ের হত্যাজনিত অপরাধ শিবাজীর উপর আরোপ করিয়াছেন

চন্দ্ররাও ও তাঁহার ভ্রাতাকে শিবাজীর সহযোগীরা যেমন ভাবে গোপনে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহা যে নিতান্ত হীন কাপুরুষতা, তদ্‌বিষয়ে কাহারো অনুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু এই হত্যাজনিত অপরাধ সম্পূর্ণ শিবাজীর স্কন্ধে চাপাইবার কোন হেতু নাই। কাপুরুষ চন্দ্ররাও শিবাজীকে গোপনে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন এবং পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও শিবাজীর বিরুদ্ধাচরণে ক্ষান্ত হন নাই বলিয়া সহযোগীরা শিবাজীর বিনা অনুমতিতে তাঁহাকে হত্যা করেন। রঘুনাথবল্লাল শিবাজীর সন্তোষবিধানার্থ এই কাপুরুষোচিত কার্য্য করিয়াছিলেন। শিবাজী চন্দ্ররাওয়ের হত্যার সুযোগ গ্রহণ করিয়া জাওলি অধিকার করিলেও তিনি রঘুনাথের কার্য্য অনুমোদন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। রঘুনাথের এই নৃশংস কার্য্যের জন্য তিনি তাহাকে ভবিষ্যতে কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত করেন নাই। মহারাষ্ট্র বখর-প্রণেতারা এই ব্যাপারে শিবাজীর চরিত্র সমর্থনের কোনও চেষ্টা করেন নাই। সম্ভবতঃ এই ক্ষেত্রে শিবাজীর কোন দোষ হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন নাই।

জাওলি অধিকৃত হওয়ায় শিবাজীর ক্ষমতা বৃদ্ধি হইল। তিনি কৃষ্ণা নদীর উৎপত্তি স্থানের অদূরে উচ্চ শৈলোপরি একটি সুরক্ষিত দুর্গ নির্ম্মাণের ইচ্ছা করেন। মোরেপন্তের উপর এই দুর্গ নির্ম্মাণের ভার ন্যস্ত হয়। তিনি অতি সুকৌশলে সুদৃঢ় দুর্গ প্রস্তুত করিয়া শিবাজীর বিস্ময়োৎপাদন করেন। এই দুর্গটি ইতিহাসে ‘প্রতাপগড়’ নামে খ্যাত।

শিবাজীর বিজয়কার্য্য অপ্রতিহত প্রভাবে চলিতে লাগিল। তিনি এক্ষণে প্রতাপগড়ের দক্ষিণস্থ নীরা নদীর তীরবর্ত্তী মারাঠা জায়গীরদারদিগকে স্বদলভুক্ত করিতে যত্নবান্ হইলেন। জাওলি জয়ের অল্পদিন পরেই শিবাজী শৃঙ্গারপুর রাজ্য আক্রমণ করেন। উক্ত রাজ্যের অধিপতি সুরবে পূর্ব্বেই ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। শিবাজী তাঁহাকে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিতে অনুরোধ করেন। তিনি শিবাজীর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। সুরবের কন্যার সহিত শিবাজীর জ্যেষ্ঠপুত্র সম্ভাজীর বিবাহ হইল।

শিবাজী যখন শৃঙ্গারপুরে শাসন সংস্কারে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে জঞ্জিরার সিদ্দিরা শিবাজীর রাজ্য আক্রমণ করে। পেশওয়ে শ্যামরাজপণ্ড ইহাদিগের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন। সিদ্দিরা শিবাজীর সৈন্যদিগকে নিষ্ঠুরভাবে নিহত করিতে থাকে। শিবাজী পেশওয়ে শ্যামরাজপণ্ডের কার্য্যপ্রণালীতে অসন্তুষ্ট হইয়া মোরেপন্ত পিঙ্গলকে পেশওয়ে নিযুক্ত করেন। নূতন পেশওয়ের বীরত্বে সিদ্দিরা কতকটা পরাভূত হইল।

শিবাজীর ক্ষমতা ও জায়গীর বাড়িতে লাগিল। ওদিকে বিজাপুরের মহম্মদ আদিল শাহের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র আলি আদিল শাহ রাজা হইয়াছেন, জননী পুত্রের রক্ষয়িত্রী হইয়া রাজকার্য্য চালাইতেছিলেন। চন্দ্ররাও ও অপর প্রধান প্রধান জায়গীরদারগণের শোচনীয় পরিণাম দর্শনে এবং বাজীশ্যামরাজের নেতৃত্বাধীন সৈন্যদলের পরাজয়ে বিজাপুর রাজপক্ষ বিচলিত হইলেন। তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিলেন যে,

শিবাজীকে সহজে পরাজয় করা সম্ভবপর হইবে না। শাহজীর উপর উৎপীড়ন করিয়াও কোন সুফললাভের আশা নাই, পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহারা উহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন।

অপ্রাপ্তবয়স্ক বিজাপুররাজ আদিল শাহের জননী শিবাজীর ক্ষমতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাওয়ায় অসহিষ্ণু হইয়া পড়িলেন। তিনি একদিন প্রকাশ্য দরবারে তাঁহার প্রধান প্রধান সেনাপতি-দের নিকট উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যে শিবাজীর স্পর্দ্ধার কথা ব্যক্ত করেন। পাঠান সেনাপতি আফ্‌জল খাঁ বেগম সাহেবাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলিয়া উঠিলেন—"আপনি একটা পাহাড়ী মূষিকের ভয়ে ভীত হইয়াছেন কেন? জীবিত অবস্থাতেই হউক বা মৃত অবস্থাতেই হউক, সেই পার্ব্বত্য ইন্দুরটাকে আমি ধরিয়া আনিয়া আপনার সমীপে উপস্থিত করিবই করিব।"

আফ্‌জল খাঁ বিজাপুরের পক্ষ হইতে সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। এবার শিবাজীকে দমন করিবার জন্য পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী ও সপ্তসহস্র পদাতিক সৈন্যসহ সেনাপতি আফ্‌জল খাঁ যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে আফ্‌জল খাঁ অনাবশ্যক অত্যাচার ও বীভৎস কার্য্যের অভিনয় করিতে লাগিলেন। তিনি হিন্দুর মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া সেই স্থানে মস্‌জিদ নির্ম্মাণের আদেশ করিলেন। পণ্ঢরপুর ও তুলজাপুর প্রভৃতি হিন্দুতীর্থের দেবমন্দির লুণ্ঠন ও দেববিগ্রহ ধ্বংস করিয়া শত শত হিন্দুর প্রাণে দারুণ আঘাত দিতে লাগিলেন। নিরপরাধ হিন্দুদিগের উপর লোমহর্ষণ অত্যাচার করিয়া পাপলালসা পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তুলজাপুরের ভবানীমন্দির নরশোণিতে প্লাবিত

হইয়াছিল। পণ্ঢরপুর তীর্থের মন্দির লুণ্ঠন ও বিগ্রহ চূর্ণ করিয়া তিনি কয়েকদিবস পরে কৃষ্ণা নদীর তীরে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

পাঠান সেনাপতি আফ্‌জল খাঁ শিবাজীর বীরত্বের বিষয় সবিশেষ জ্ঞাত ছিলেন। শিবাজীকে প্রকাশ্য যুদ্ধে পরাজয় করা যে সহজসাধ্য নহে, তিনি তাহা বুঝিতেন। কৌশলে শিবাজীকে হত্যা বা বন্দী করিবার অভিপ্রায়ে তিনি কৃষ্ণাজী ভাস্কর নামক জনৈক ব্রাহ্মণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

এদিকে শিবাজী আফ্‌জল খাঁর সসৈন্যে আগমন সংবাদ পাইয়া চিন্তিত হইলেন। লোকমুখে তিনি পাঠান সেনাপতির স্পর্দ্ধা-প্রকাশ, হিন্দু-মন্দির ধ্বংস, নিরপরাধ ব্যক্তিবর্গের প্রতি নৃশংস অত্যাচার প্রভৃতি সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলেন।

জননী জীজাবাইর আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া অনুরক্ত সৈন্যসামন্তসহ শিবাজী যুদ্ধে চলিলেন। রাজধানী রায়গড় হইতে তিনি প্রতাপগড়ে আসিলেন। পাঠান সেনাপতি আফ্‌জলের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তিনি প্রতাপগড়ই উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্ব্বাচন করিলেন। এই গড়টি জাওলি প্রদেশের অন্তর্গত, অরণ্যময় ও পর্ব্বতাকীর্ণ।

প্রতাপগড়ে অবস্থিত হইয়া শিবাজী যখন যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন, তখন আফ্‌জল খাঁর প্রেরিত ব্রাহ্মণদূত কৃষ্ণাজী শিবাজীর সমীপে উপস্থিত হন। আফ্‌জল বন্ধুতার ভাণ করিয়া দূতমুখে শিবাজীকে অনেক কথা জানাইলেন। তিনি তাঁহাকে

বিজাপুররাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়া কোঙ্কণ প্রদেশের জায়গীর ভোগ করিতে উপদেশ প্রদান করেন। বুদ্ধিমান্ শিবাজী আফ্‌জলের চাতুরী বুঝিতে পারিলেন। তিনি দূতকে যথোচিত সম্মান দেখাইয়া কৌশলে তাঁহার মুখ হইতে পাঠান সেনাপতির ষড়যন্ত্র জানিয়া লইলেন। গোপীনাথ পণ্ড নামক জনৈক বুদ্ধিমান্ কর্ম্মচারীকে তিনি আফ্‌জলের নিকট প্রেরণ করেন। শিবাজী আফ্‌জলকে প্রতাপগড়ের সন্নিকটে আহ্বান করেন। পরস্পর মিত্রভাবে সাক্ষাৎ করার প্রস্তাব হইয়া গেল।

আফ্‌জল খাঁ শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলে শিবাজী তাঁহার অবস্থানের নিমিত্ত প্রতাপগড়ের পাদদেশে একটি সুন্দর শিবির নির্ম্মাণ করেন। শিবাজীর সন্নিবেশিত শিবিরে আগমন করিয়া আফ্‌জল শিবাজীকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আহ্বান করেন। তিনি আফ্‌জল খাঁকে একদিন বিশ্রাম করিয়া পথিশ্রমজনিত ক্লান্তি দূর করিতে অনুরোধ করিলেন। পরদিন শিবাজী পাঠান সেনাপতির বাসভবনে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন স্থির হইল। আফ্‌জল উৎকণ্ঠিতভাবে তথায় এক রাত্রি যাপন করেন।

এস্থলে একটা কথা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ফ্‌জল ও শিবাজী পরস্পর সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেও কেহ কাহাকেও একতিল পরিমাণও বিশ্বাস করিতে পারেন ই। দুই জনেই নিকটবর্ত্তী উপত্যকায় ও গভীর অরণ্যে জ নিজ সৈন্য লুক্কায়িত রাখিয়া আশু যুদ্ধের প্রতীক্ষা

করিতেছিলেন। একে অন্যকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিবার শুভমুহূর্ত্ত খুঁজিতেছিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে শিবাজী পূর্ব্বেই গুপ্তভাবে সৈন্যসন্নিবেশ করিলেন। কি প্রকাশ্য, কি গুপ্ত, কোন পথই তিনি অরক্ষিত অবস্থায় রাখিলেন না। পরে সন্তাজী কাওজী ও জিউমহালা নামক দুইজন বীরকে সঙ্গে করিয়া অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ আফ্‌জলের শিবিরাভিমুখে চলিলেন। এদিকে আফ্‌জল খাঁও সৈন্যসহ শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন; পাছে বহুসংখ্যক সৈন্য-পরিবৃত দেখিলে শিবাজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অসম্মত হন, সেই ভয়ে তিনি সৈন্যদিগকে কিয়দ্দূরে রাখিয়াছিলেন।

শিবাজী তাঁহার সৈন্যদল কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া দুইজন বলিষ্ঠ সঙ্গী সমভিব্যাহারে পদব্রজে শিবিরে প্রবেশ করিলেন। আফ্‌জল খাঁ দূর হইতে তিন জনকে আসিতে দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া শিবাজীকে চিনিয়া লইলেন। শিবাজীর অস্ত্রাদি তাঁহার বস্ত্রাভ্যন্তরে লুক্কায়িত ছিল; তিনি লৌহবর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহচরদ্বয়ও ঐভাবে আসিয়াছিলেন। শিবাজী ও তাঁহার বন্ধুদ্বয়কে নিরস্ত্র দেখিয়া আফ্‌জলের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি অসহিষ্ণু হইয়া পড়িলেন। তিনি আলিঙ্গন করিবার ছলে শিবাজীকে বাম বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া ক্ষিপ্রবেগে কোষ হইতে তরবারি বাহির করিয়া দক্ষিণ হস্তে তাঁহাকে আঘাত করেন। আফ্‌জল খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পাইবামাত্রই শিবাজী তাঁহার দক্ষিণ হস্তদ্বারা আফ্‌জলের উদরমধ্যে "বাঘনখ" এবং বক্ষে

একখানি ছুরি প্রবেশ করাইয়া দিলেন। সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া পাঠান সেনাপতি উচ্চৈঃস্বরে কাতর চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এবং দারুণ আক্রোশের সহিত শিবাজীকে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করেন। শিবাজীর বর্ম্ম ফাটিয়া গেল। তিনি ক্ষণবিলম্ব না করিয়া ভবানী-তরবারিদ্বারা আফ্‌জলের শিরশ্ছেদন করিলেন। আফ্‌জলের চীৎকার শুনিয়া একজন পাঠান এবং জনৈক ব্রাহ্মণবীর তাঁহার সাহায্যার্থ উপস্থিত হইয়াছিল। শিবাজীর সহচরেরাও তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। পাঠান নিহত হইল ; ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। অত্যল্পকালমধ্যে এই ভীষণ কাণ্ড ঘটিয়া গেল। শিবাজী শত্রুসংহার করিয়া অবিলম্বে স্বীয় দুর্গে গিয়া তোপধ্বনি করিলেন। তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিক হইতে মারাঠা বীরেরা মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিল। সহসা আক্রান্ত হইয়া তাহারা ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল। আফ্‌জল খাঁর বিরাট্ সৈন্যদল ছিন্ন ভিন্ন ও নিহত হইল।

মুসলমান ঐতিহাসিকেরা এবং গ্রাণ্ট ডফ্ প্রমুখ বিদেশী ইতিহাস-লেখকগণ আফ্‌জল খাঁর হত্যাকাণ্ড শিবাজীর চরিত্রের দুরপনেয় কলঙ্ক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, শিবাজীই প্রথমে আফ্‌জলকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। এদিকে মহারাষ্ট্র দেশের গ্রন্থকারেরা বলেন, আফ্‌জল খাঁই প্রথমে শিবাজীকে আক্রমণ করেন।

আফজল খাঁ এবং শিবাজী একে অন্যকে হত্যা করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহাদের যুদ্ধের আয়োজন এবং প্রণালী দেখিয়া তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়।

শিবাজী আফ্‌জলকে নিতান্ত অকারণে হত্যা করিয়াছেন, একথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়, সন্দেহ নাই। আফ্‌জল শিবাজীকে বহু প্রকারে দুঃসহ মনঃপীড়া দিয়াছেন। তিনি শিবাজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হত্যায় লিপ্ত ছিলেন, পিতা শাহজীকে বন্দী করিবার প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন, পবিত্র হিন্দুতীর্থ ও মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন, নিরপরাধ হিন্দুদের রক্তে দেশ রঞ্জিত করিয়াছিলেন, শিবাজীকে জীবিত বা মৃত বন্দী করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন এবং সর্ব্বোপরি শিবাজীর ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের উচ্চ অভিলাষ চূর্ণ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি সেই সময় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে গুপ্তভাবে হত্যা করা সমাজে একটা হেয় পাপ বলিয়া পরিগণিত হইত না। তৎকালের সামাজিক অবস্থা ও পাপপুণ্যের সাধারণ আদর্শ মনে রাখিয়া বিচার করিলে শিবাজীর অপরাধ মার্জ্জনীয় বলিয়া মনে হইবে।

আফ্‌জল খাঁর পতনের পর শিবাজী পনহালা ও কৃষ্ণা নদীর তীরবর্ত্তী রাজ্য জয় করেন।

শিবাজীকে দমন করিবার নিমিত্ত বিজাপুর হইতে দ্বিতীয়বার একদল সৈন্য প্রেরিত হইল। এবারেও বিজাপুররাজ পরাজিত হইলেন। বিজয়ী শিবাজী পরাজিত সৈন্যদিগকে অনুসরণ করিতে করিতে বিজাপুর নগরের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। এদিকে শিবাজীর প্রধান সেনাপতিরা রাজাপুর ও দাভোল জয় করেন। শিবাজীর রাজ্য ক্রমে বাড়িতে

লাগিল। শিবাজী যখন পনহালা দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সহসা বিজাপুররাজ একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়া উক্ত দুর্গটি অবরোধ করিলেন। বুদ্ধি-চাতুর্য্যে শিবাজী কাহারো অপেক্ষা হীন ছিলেন না। তিনি কৌশলে দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়া রাঙ্গানায় গমন করেন। বিজাপুরসৈন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করে। পথিমধ্যে একটি সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটে বাজীপ্রভু এক সহস্রমাত্র মাওলী সৈন্যসহ বিজাপুরের বিরাট্ সৈন্যদলকে আক্রমণ করেন। রাঙ্গানার নিকটবর্ত্তী এই সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটটিকে মহারাষ্ট্রদেশের থার্ম্মপলি বলা যাইতে পারে। এই দিনের যুদ্ধে বাজীপ্রভু অনন্যসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ ক্রমাগত নয় ঘণ্টাকাল যুদ্ধ করিয়াছিলেন; ভীষণ যুদ্ধে তাঁহার সৈন্যদলের তিন-চতুর্থাংশ নিহত হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন দান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, শিবাজী নিরাপদে রাঙ্গানায় উপনীত হইয়াছেন।

১৬৪১ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং বিজাপুররাজ শিবাজীকে দমন করিবার নিমিত্ত যুদ্ধযাত্রায় বাহির হইলেন। প্রায় একবৎসরকাল তিনি যুদ্ধ চালাইলেন, কিন্তু কোনক্রমে শিবাজীর শক্তি খর্ব্ব করিতে পারিলেন না। পক্ষান্তরে শিবাজীর শক্তি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তিনি নৌ-সৈন্য গঠন করিয়া জঞ্জিরা ব্যতীত কোঙ্কণ প্রদেশস্থ অপর সামুদ্রিক বন্দরগুলি জয় করিলেন।

১৬৬২ খৃষ্টাব্দে বিজাপুররাজের সহসা চৈতন্যোদয় হইল।

তিনি দেখিলেন, একমাত্র শিবাজীকে দমন করিবার নিমিত্ত তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত তিনি শাহজীকে পুনর্ব্বার কর্ম্মে নিযুক্ত করা একান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি শিবাজীর সহিত সন্ধি করিলেন। শিবাজী যে যে স্থান জয় করিয়াছিলেন, বিজাপুররাজ সমস্তই তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। শিবাজীর কর্ম্মজীবনের প্রথমভাগের শেষে তাঁহার জায়গীর চাকণ হইতে আরম্ভ করিয়া নীরা নদীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সহ্যাদ্রি শৈলমালার উপর নির্ম্মিত পুরন্দর হইতে আরম্ভ করিয়া কল্যাণ পর্য্যন্ত দুর্গগুলি তাঁহার আয়ত্ত ছিল। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার কর্ম্মজীবনের দ্বিতীয় অংশের শেষভাগে তাঁহার জায়গীর সমস্ত কোঙ্কণ, কল্যাণ, গোয়া ও ঘাটমাথায় বিস্তৃত হইয়াছে। উত্তর দক্ষিণে ভীমা নদী হইতে ওয়ার্ণা নদী পর্য্যন্ত প্রায় একশত ষাট মাইল এবং ঘাট পর্ব্বত-শ্রেণীর একশত মাইল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার জায়গীর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

শিবাজী যখন দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত, তখন একবার বিজাপুররাজ পূর্ব্বোক্ত সন্ধির সর্ত্ত ভাঙ্গিয়া শিবাজীর রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। শিবাজীর প্রধান সেনানায়ক প্রতাপরাও গুজর বিজাপুরের সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তিনি পলায়নপর সৈন্যদিগের পশ্চাদ্ধাবন করেন নাই। শিবাজী এই নিমিত্ত প্রতাপকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। বিজাপুরের সেনাপতিরা আবার যখন শিবাজীর জায়গীর আক্রমণ করেন, ক্রুদ্ধ প্রতাপ তখন

শিবাজী ও রামদাস স্বামী

তাহাদিগের অসংখ্য সৈন্য নিপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার অমূল্য জীবনও যুদ্ধক্ষেত্রে হারাইয়াছিলেন।

বিজাপুররাজ এইরূপে দুইবার তাঁহার সন্ধির সর্ত্ত ভাঙ্গিয়া শিবাজীর রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে মোগল সম্রাট্‌ যখন বিজাপুর অবরোধ করেন, তখন বিপন্ন বিজাপুর-রাজ শিবাজীর আশ্রয় ভিক্ষা করেন। উদারহৃদয় শিবাজী পূর্ব্ব শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া বিজাপুররাজকে সাহায্য করেন এবং তাহার ফলেই সেইবার মোগলেরা পরাস্ত হয়।

মোগলযুদ্ধ ও সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠা

(১৬৬২—৮০)

শিবাজী রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ১৬৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কখন মোগলদিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন নাই। সত্য বটে ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মোগলাধিকৃত জুন্নর লুণ্ঠন করেন; কিন্তু সেই ক্ষুদ্র বিবাদে কোন পক্ষেরই শত্রুতার ভাব সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হয় নাই।

সম্রাট্‌ শাহজাহানের রাজত্বকালে সুচতুর শিবাজী সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। বিজাপুররাজের হস্ত হইতে কারারুদ্ধ পিতার মুক্তিসাধন ঐ বশ্যতা স্বীকারের প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও তাঁহার আর একটি উদ্দেশ্যও ছিল। তিনি তখন মোগলাধিকৃত জুন্নর ও আমেদনগর নামক দুইটি স্থানের উপর তাঁহার ন্যায্য দাবী মোগলসম্রাটের গোচর করিয়াছিলেন।

মোগলসম্রাট্ শিবাজীর দাবী একেবারে অগ্রাহ্য করেন নাই বিচার করিয়া দেখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

অতঃপর সম্রাট্ শাহজাহান যখন সঙ্কটাপন্ন রোগে আক্রান্ত হন, অওরঙ্গজেব ভাইদের সহিত যুদ্ধ করিয়া সিংহাসন অধিকারমানসে দিল্লী যাত্রা করেন, তখন তিনি কোঙ্কণ প্রদেশ শিবাজীর অধিকারভুক্ত বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাঁহাকে মিত্ররূপে নর্ম্মদানদীর তীরবর্ত্তী মোগলরাজ্যে শান্তিরক্ষক হইতে অনুরোধ করেন।

যখন ভাইদিগকে হত্যা করিয়া অওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিলেন, তখন তিনি পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হইলেন। পূর্ব্বে তিনি শিবাজীর যে অধিকার স্বয়ং স্বীকার করিয়াছিলেন, এখন রাজ্য বিস্তার-লালসায় তাহা বিস্মৃত হইলেন। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে মোগল সৈন্যেরা শিবাজীর জায়গীরের উত্তর প্রান্তস্থ কল্যাণ বলপূর্ব্বক অধিকার করে। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত শিবাজী মোগল সম্রাটের এই অন্যায় আক্রমণের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বিজাপুররাজের সহিত সন্ধি হইয়া যাইবার পর অনতিবিলম্বেই শিবাজীর বিক্রমশালী সেনাপতি ঔরঙ্গাবাদ আক্রমণ করেন এবং পেশওয়ে মোরেপন্ত পিঙ্গলে জুন্নরের উত্তরস্থ মহারাষ্ট্রদেশের মোগলদুর্গগুলি জয় করিয়া লইলেন। মোগলদিগের সহিত মারাঠারা প্রবলভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। উভয় পক্ষই একে অন্যের শক্তি খর্ব্ব করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এতদিন

শিবাজী মোগলরাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে দণ্ডায়মান হইলেন।

মোগল সেনাপতি সায়েস্তা খাঁ পুণা ও চাকান জয় করিলেন। তিনি পুণা নগরে সসৈন্যে অবস্থান করিয়া শিবাজীর সহিত যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন।

সিংহগড়ে আসিয়া শিবাজী সায়েস্তা খাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। সায়েস্তা খাঁর আদেশে এই সময়ে কোনো মারাঠা পদাতিক কিংবা অশ্বারোহী সৈন্য পুণা সহরে প্রবেশ করিতে পাইত না। সায়েস্তা খাঁ পুণা নগরে শিবাজীর বাল্য-কালের বাসভবনটি অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন।

শিবাজী একদিন সায়েস্তা খাঁকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে পঁচিশজন বাছা বাছা বীরপুরুষসহ একটা বিবাহের দলে মিশিয়া পুণা নগরে প্রবেশ করেন। এইরূপে তিনি সঙ্গিগণসহ নির্ব্বিবাদে সায়েস্তা খাঁর শয়ন-গৃহের সমীপে উপনীত হন। ঐ ঘরটির জানালা, দরজা প্রভৃতি কোন্‌টা কোথায়, শিবাজী তাহা সম্যক্ অবগত ছিলেন। তিনি পশ্চাৎ দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করেন। এক পরিচারিকার মুখে খবর পাইয়া সায়েস্তা খাঁ একটি জানালা দিয়া পলায়ন করেন। দ্রুত পলায়নকালে শিবাজীর তরবারির আঘাতে তাঁহার তিনটি অঙ্গুলি ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এইরূপে সায়েস্তা খাঁকে তাঁহার শয়নকক্ষে আক্রমণ করিয়া শিবাজী যখন প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন একদল মোগল সৈন্য তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল। শিবাজীর সেনাপতি নেতাজী পালকর ঐ সৈন্য-

দিগকে পরাজিত করেন। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে এই কাণ্ড ঘটে।

১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে শিবাজী সুরাট বন্দর আক্রমণ করেন। সুরাট মোগলরাজ্যভুক্ত একটা প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল। এই স্থান আক্রমণ করিয়া আপন রাজ্য হইতে মোগল সৈন্য দূরীভূত করাই শিবাজীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সিংহগড় হইতে তাঁহার সৈন্যদল লইয়া শিবাজী যখন দূরবর্ত্তী সুরাট বন্দরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন মোগল-সেনাপতিরা মনে করিতেছিলেন, শিবাজী পর্ত্তুগীজ ও সিদ্দিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন। বুরহানপুর নগরের সন্নিকটে শিবির সন্নিবেশ করিয়া শিবাজী সসৈন্যে দুই দিন অহোরাত্র বন্দর লুণ্ঠন করেন। যে সকল মোগল এই আক্রমণে বাধা দিতে অগ্রসর হইয়াছিল তাহারা নিহত হইল।

এই লুণ্ঠনকালে শিবাজী সর্ব্বধর্ম্মের প্রতি তাঁহার ঔদার্য্য দেখাইয়াছিলেন। তিনি মুসলমানদের মস্‌জিদ, খ্রীষ্টানদের গির্জ্জার প্রতি হস্তার্পণ করেন নাই। শিবাজী এই বন্দর লুণ্ঠন করিয়া অপরিমিত ধনরত্ন লাভ করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারের পর হইতে মোগলেরা শিবাজীর ভয়ে অতীব ভীত হইয়া পড়িল। শিবাজী ক্ষিপ্রগতিতে নানাস্থান আক্রমণ করিয়া তাহাদিগের মনে বিষম ত্রাস উৎপাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নৌ-সৈন্যদল এই সময়ে সুরাট হইতে মক্কাযাত্রী একখানি মুসলমান জাহাজ অধিকার করে। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার একদল নৌ-সৈন্য গোয়ার দক্ষিণ-বর্ত্তী একটি সমৃদ্ধ বন্দর লুণ্ঠন করে। এই সমস্ত আক্রমণের ফলে উত্তর-কর্ণাটে শিবাজীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল।

মহাপরাক্রমশালী শিবাজীর ভয়ে দিল্লীশ্বর বিচলিত হইলেন। সায়েস্তা খাঁর রণকৌশল ও বুদ্ধিমত্তা ব্যর্থ হইল। তিনি প্রতিপদে শিবাজীর নিকট পরাজিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার পরাজয়ে দিল্লীর সম্রাট্ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনের নিমিত্ত সসৈন্যে মহারাজ জয়সিংহ ও দিলির খাঁকে পাঠাইলেন। নূতন সেনাপতিদ্বয় মোগলবাহিনীসহ অপ্রতিহতভাবে মহারাষ্ট্রদেশে প্রবেশ করিলেন। অম্বরাধিপতি জয়সিংহ পুরন্দর অবরোধ করিলেন।

নূতন মোগলসৈন্য যখন মহারাষ্ট্র দেশে প্রবেশ করে, শিবাজী তখন নৌ-যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন; তিনি রায়গড়ে আগমন করিয়া এই সংবাদ শুনিতে পাইলেন। তাঁহার আদেশে মারাঠা সেনানায়কেরা নানা দিক্ হইতে আক্রমণ করিয়া মোগল সৈন্য-দিগকে ব্যতিব্যস্ত করিতে আরম্ভ করে। জয়সিংহ দিলির খাঁর উপর পুরন্দর অবরোধের ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং সিংহগড় আক্রমণ করেন। তিনি ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াও একটি মারাঠা-দুর্গ দখল করিতে পারিলেন না। মারাঠাদিগের বীরত্বে তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। মোগল-সেনাপতিদিগের যুদ্ধকৌশল, বুদ্ধিমত্তা, শক্তিসামর্থ্য, অর্থব্যয়—সব ব্যর্থ হইতে লাগিল।

এদিকে পুরন্দর দুর্গে মুরার বাজীপ্রভু সবেমাত্র দুই সহস্র সৈন্য লইয়া অসংখ্য মোগলবাহিনীর সহিত যুদ্ধ চালাইয়া রণ-চাতুর্য্য দেখাইতে লাগিলেন। যুদ্ধের পর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। দ্বি-সহস্র মারাঠাসৈন্যের নিকট অসংখ্য মোগলকে হার মানিতে

হইল। বহুকাল ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। মুরার আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। বাজীপ্রভুর মৃত্যুর পর তাঁহার অধীনস্থ মাওলীসৈন্যগণ নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে নাই। তাহাদের শত্রুনির্য্যাতন-স্পৃহা বাড়িয়া গেল। পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বীরত্বের সহিত তাহারা দুর্গরক্ষা করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে বর্ষাঋতু উপস্থিত হওয়ায় কিছুকালের জন্য যুদ্ধ স্থগিত হয়। শিবাজী ও তাঁহার সহচরগণের বীরত্বে অম্বরাধিপতি জয়সিংহ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, বিশাল মোগলবাহিনীর স্রোতোমুখে শিবাজী ও তাঁহার সৈন্যদল তৃণের মত ভাসিয়া যাইবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তিনি তাঁহাদিগের চাতুর্য্যে প্রতিপদে প্রতিহত হইতে লাগিলেন।

এই সময়ে সহসা কি নিগূঢ় অভিপ্রায়ে শিবাজী দিল্লীশ্বরের হিন্দুসেনাপতি জয়সিংহের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন, কাপ্তেন গ্রাণ্ট্ ডফ্ ও অন্য ঐতিহাসিকেরা তাহার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

মারাঠা বখর-প্রণেতারা বলেন, শিবাজী এই সঙ্কটকালে তাঁহার আরাধ্যা ভবানী দেবীর আদেশ লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে যাইতেছিলেন। অম্বররাজ জয়সিংহও দেবীর ভক্ত, তজ্জন্য দেবী শিবাজীকে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে নিষেধ করেন। যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিতে পারিবেন না বলিয়াই শিবাজী জয়সিংহের সহিত সন্ধি করিয়াছেন। বখর-প্রণেতাদের এই উক্তির মূলে কতখানি সত্য নিহিত আছে, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের 'মডার্ন রিভিউ' পত্রে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের অনূদিত একখানি পারসিক হস্তলিপিতে প্রকাশ যে, জয়সিংহের সৈন্যবল দর্শনে শিবাজী ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। একদিকে মোগল-সৈন্যেরা তাঁহার রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া তাঁহাকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। অপর দিকে দিলির খাঁ ও কিরণ সিংহ পুরন্দর দুর্গের নিম্নার্দ্ধ জয় করিয়া উচ্চ শৈলোপরি অবস্থিত প্রধান দুর্গেরও দুইটি প্রাচীর অতিক্রম করিয়াছিল। তাঁহারা যখন তৃতীয় প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবার জন্য ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত, তখন শিবাজী বশ্যতা স্বীকার করায় যুদ্ধ স্থগিত হইয়া যায়।

যে কোন কারণেই হউক, শিবাজী সন্ধি করিলেন। সন্ধির সর্ত্তানুসারে তিনি তাঁহার ৩২টা দুর্গের মধ্যে ২০টাই মোগল-সম্রাট্‌কে ছাড়িয়া দিলেন, এবং ইতঃপূর্ব্বে তিনি যতটুকু মোগল-রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, তাহাও প্রত্যর্পণ করিলেন।

শিবাজী মোগলরাজসরকারে চাকুরী গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন। জননী জীজাবাইয়ের অধীনে থাকিয়া তিনজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী তাঁহার জায়গীররক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। মোগলসম্রাটের পক্ষ হইয়া তিনি জয়সিংহের সহিত বিজাপুর-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

ইতঃপূর্ব্বেই দিল্লীশ্বরের নিকট শিবাজীর আনুগত্য স্বীকারের সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল। তিনি শিবাজীকে অভয় প্রদান করিয়া দিল্লীতে আহ্বান করেন। শিবাজী পাঁচ শত অশ্বারোহী ও এক সহস্র মাওলী সৈন্যসহ সপুত্রক দিল্লী যাত্রা করিলেন।

ক্রমাগত দুইমাসকাল পথ বহিয়া তিনি দিল্লীনগরপ্রান্তে উপনীত হইলেন। মোগলসম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তিনি যে ভুল করিয়াছেন, নগরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন। শিবাজীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া গর্ব্বিত দিল্লীশ্বর তাঁহার উপযুক্ত অভ্যর্থনার আয়োজন করিলেন না। অম্বরপতি জয়সিংহের পুত্র রামসিংহ ও জনৈক নিম্নশ্রেণীর রাজকর্ম্মচারী তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবাজী সম্রাট্‌কৃত এই অবজ্ঞা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন। যাহা হউক, তিনি অবিচলিতভাবে অপমান সহ্য করিয়া দিল্লীশ্বরের সহিত দেখা করিতে চলিলেন। সম্রাট্‌সমীপে উপনীত হইবামাত্র তিনি তাঁহার ভুল অতি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, মোগলসম্রাট্ তাঁহাকে মিত্ররাজরূপে অভ্যর্থনা করিবেন, কিন্তু হায়, বাদসাহের আমদরবারে আসিয়া তিনি দেখিলেন, তৃতীয় শ্রেণীর মন্‌সবদার-দিগের সহিত তাঁহার বসিবার আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শিবাজী ক্রোধে আত্মহারা হইলেন। তিনি সম্রাটের অনতিদূরে দাঁড়াইয়া রামসিংহের সহিত সম্রাট্‌কৃত দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। প্রতিবাদ সম্রাটের কাণে গেল। তিনি শিবাজীর দরবারে আসা বন্ধ করিয়া দিলেন।

দরবার হইতে ফিরিয়া আসিয়া শিবাজী দেখিতে পাইলেন, মোগল সিপাহীশান্ত্রীরা তাঁহার বাসভবনের চতুর্দ্দিকে পাহারা দিতেছে। সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া তিনি কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন। এত বড় ভুল আর তিনি তাঁহার জীবনে

কখনো করেন নাই। তিনি সাধ করিয়া শত্রুর হস্তে বন্দী হইয়াছেন।

বিপদে পড়িয়া শিবাজী কোনোদিন ধৈর্য্যচ্যুত হইতেন না। তিনি নীরবে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পাঁচ সহস্র শত্রুসৈন্য দিবারাত্রি তাঁহাকে পাহারা দিতেছিল। অল্প-সংখ্যক সৈন্য লইয়া তিনি অসংখ্য শত্রুর সহিত প্রকাশ্য যুদ্ধ করিবেন কি করিয়া? কৌশলে উদ্ধারলাভের কোনো উপায় উদ্ভাবনের নিমিত্ত তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত সহচর পণ্ডিত রঘুনাথ পন্তের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। দুইজনে পরামর্শ করিয়া দিল্লীশ্বরকে জানাইলেন—"এ স্থানের জলবায়ু মারাঠা-সৈন্যেরা সহ্য করিতে পারিতেছে না, সম্রাট্ তাহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাগমনের অনুমতি দিন্।" সম্রাট্ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, সৈন্যসামন্তশূন্য হইয়া শিবাজী একান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িবেন। শিবাজীর অনুরক্ত সৈন্যেরা তাহাদিগের প্রভুকে একান্ত অসহায় অবস্থায় বিপদের মুখে ফেলিয়া যাইতে নানা আপত্তি করিল। তিনি তাহাদিগের আপত্তি খণ্ডন করিয়া বলিলেন—"তোমরা স্বদেশে যাও, আমি অচিরকালমধ্যে তোমাদের সহিত মিলিত হইব।" সৈন্যেরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও চলিয়া গেল।

সৈন্যদিগকে বিদায় দিয়া শিবাজী অনেকটা হাল্‌কা হইলেন। তিনি বুদ্ধির সাগর, নিজের বুদ্ধির প্রতি তাঁহার যথেষ্ট আস্থা ছিল। প্রতি বৃহস্পতিবারে মহা ধূমধামের সহিত তিনি ঠাকুর পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ উপলক্ষে

ব্রাহ্মণ, কাঙ্গাল ও সাধুসজ্জনদিগকে বড় বড় চুবড়ীতে করিয়া নানাবিধ খাদ্য ও মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইত। প্রথম প্রথম দ্বাররক্ষকেরা চুবড়ীগুলি পরীক্ষা করিয়া বাহিরে যাইতে দিত। কিন্তু এইরূপ ব্যাপার যখন দীর্ঘকাল চলিতে লাগিল, তখন তাহারা পরীক্ষা করা আবশ্যক মনে করিল না। সুযোগ বুঝিয়া এক বৃহস্পতিবারে শিবাজী অসুখের ভাণ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট কয়েক ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারো তাঁহার সহিত দেখা করিবার অনুমতি ছিল না। সেদিন আবার শিবাজীর রোগশান্তি-কামনায় প্রচুর নৈবেদ্য মানৎ করা হইয়াছিল। পরদিন শুক্রবার প্রাতঃকাল হইতেই ভোজ্যদ্রব্য বিতরণ করা আরম্ভ হইল। রাত্রিকালে শিবাজী ও তাঁহার পুত্র দুইটি চুবড়ীতে প্রবেশ করিয়া নগরের বাহির হইয়া পড়েন। শিবাজী মুক্তি লাভ করিলেন।

তিনি দিল্লী হইতে মথুরায় আসিলেন। তথায় আসিয়া মস্তক-মুণ্ডন ও ভস্মলেপন করিয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলেন। সেখান হইতে প্রয়াগে, প্রয়াগ হইতে বারাণসী, বারাণসী হইতে গয়াতীর্থে, গয়া হইতে কটকে, কটক হইতে হায়দরাবাদে—এইরূপ নানা তীর্থ ও জনপদ ভ্রমণ করিয়া দশমাস পরে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া শিবাজী দেখিলেন যে, তাঁহার রাজ্য পূর্ব্ববৎ সুশৃঙ্খল ও সুরক্ষিত অবস্থাতেই রহিয়াছে; তাঁহার অনুপস্থিতিহেতু বিন্দুমাত্র গোলমাল ঘটে নাই।

শিবাজীর দিল্লীযাত্রা তাঁহার জীবনের মস্ত একটা ভুল। ঐ

সময়টা সমগ্র মারাঠাজাতির একটি সঙ্কটের সময়। তাহাদের নেতা শিবাজী সপুত্রক দিল্লীনগরে বন্দী, প্রধান প্রধান দুর্গ ও দেশের সমতল ভূ-ভাগ মোগলদের করায়ত্ত। এইরূপ ভীষণ সময়েও শিবাজীর একজন কর্ম্মচারীও বিশ্বাসঘাতক হইয়া শত্রুদলে যোগদান করে নাই এবং রাজ্যের শাসনকার্য্যও অতি সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছিল। প্রত্যেক কর্ম্মচারী অবিচলিতভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য-সাধন করিতেছিলেন; তাঁহারা যে নেতাশূন্য হইয়াছেন, কর্ম্মচারীদের ভাবে ও কার্য্যে তাহা প্রকাশ পায় নাই। শিবাজী দিল্লী হইতে পলায়ন করিয়াছেন, এই সংবাদ যখন দাবানলের ন্যায় মহারাষ্ট্র দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, তখন সমগ্রজাতি নূতন উদ্যমে শত্রুবিজয়-কার্য্যে নিযুক্ত হইল। আবার মারাঠারা একটি একটি করিয়া মোগলাধিকৃত দুর্গগুলি জয় করিতে লাগিল। শিবাজী স্বদেশে প্রত্যাগত হইবার পূর্ব্বেই পেশওয়ে মোরেপন্ত পুণার নিকটবর্ত্তী দুর্গগুলি ও কল্যাণ-প্রদেশের একাংশ জয় করিয়াছিলেন।

মোগলসম্রাট্ অওরঙ্গজেব শিবাজীর দর্প চূর্ণ করিবার নিমিত্ত তৃতীয়বার সৈন্য প্রেরণ করেন। এবার কুমার মৌজম দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধি ও যোধপুরের রাণা যশোবন্ত সিংহ সেনানায়ক হইয়া আসিয়াছেন।

মৌজম শিবাজীর সহিত যুদ্ধ না করিয়া মিত্রতা স্থাপনে উদ্‌যোগী হইলেন। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি শিবাজীর সহিত সন্ধি করিলেন। এবার দিল্লীশ্বর শিবাজীকে "রাজা" উপাধি দান করিলেন; তাঁহার পুত্র পাঁচ হাজারী মন্‌সবদার হইলেন

এবং আমেদনগর ও জুন্নর এই দুই স্থানের উপর শিবাজীর দাবী স্বীকার করিয়া মোগল-সম্রাট্ শিবাজীকে তৎপরিবর্ত্তে বেরারে এক খণ্ড জায়গীর দিলেন। শিবাজী তাঁহার পূর্ব্বাধিকৃত সমস্ত জায়গীর ফিরিয়া পাইলেন, কেবলমাত্র সিংহগড় ও পুরন্দর দুর্গ দিল্লীশ্বরের অধীনে রহিয়া গেল।

সন্ধির সর্ত্তানুসারে শিবাজী মোগলসম্রাটের সামন্ত হইয়াছেন। যুদ্ধকালে মোগল-সম্রাটকে একদল অশ্বারোহী সৈন্যদ্বারা সাহায্য করিবার নিমিত্ত তিনি প্রতিশ্রুত রহিলেন। ঔরঙ্গাবাদের নিকটে শিবাজীর সেনাপতি প্রতাপরাও গুজর এই অভিপ্রায়ে একদল সৈন্য লইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সন্ধি দুই বৎসরকাল স্থায়ী হইয়াছিল।

১৩৬৯ খৃষ্টাব্দে বিজাপুররাজের সহিত মোগলসম্রাট্ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। শিবাজী এই সন্ধির পক্ষ ছিলেন না বটে, কিন্তু মোগলসম্রাটের মিত্র বলিয়া দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্যদ্বয়ের উপর তাঁহার চৌথ ও সরদেশমুখী দাবী স্বীকার করেন। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা প্রদেশের রাজারা শিবাজীকে যথাক্রমে তিন ও পাঁচ লক্ষ মুদ্রা করদানে প্রতিশ্রুত হইলেন।

ক্ষমতায় শিবাজী এখন দাক্ষিণাত্যে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন। মোগলসম্রাটের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তিনি অল্পকালমধ্যে আপনাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছেন। এইরূপে বুদ্ধিবলে আপনার বলবৃদ্ধি করিয়া তিনি ভাবী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

মোগলসম্রাট্ অওরঙ্গজেব শিবাজীর ভয়ে সর্ব্বদা ভীত ছিলেন। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার পুত্র কুমার মৌজমকে জানাইলেন, "ছলে বলে কৌশলে, যেমন করিয়া পার শিবাজীকে দমন করিবেই করিবে।" সুচতুর প্রতাপরাও গুজর সম্রাটের এই দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া সসৈন্যে ঔরাঙ্গাবাদ হইতে পলায়ন করেন। শিবাজীকে আবার বিশাল মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইল।

সিংহগড় দুর্গটি প্রায় পাঁচ বৎসর যাবৎ মোগলদের হস্তে রহিয়া গিয়াছে। আত্মরক্ষার নিমিত্ত এক্ষণে ঐ দুর্গটি অধিকার করিবার দরকার হইল। সিংহগড়ে মোগলপক্ষীয় রাজপুত সৈন্যেরা বাস করিতেছিল। শিবাজী তানাজী মালসুরেকে ঐই দুর্গজয়ের ভার অর্পণ করেন। তানাজী ও তাঁহার ভ্রাতা সূর্য্যাজী বাছা বাছা পাঁচশত মাওলী সৈন্যসহ সিংহগড়ের অভিমুখে যাত্রা করেন। গভীর রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে অসমসাহসিক তানাজী দুর্গপ্রাচীর বাহিয়া সৈন্যসহ শত্রুদুর্গে প্রবেশ করেন। সতর্ক রাজপুত প্রহরীরা অবিলম্বে তাঁহাদের প্রবেশ জানিতে পারিল। অল্পকালমধ্যে দুইপক্ষে ঘোর সংগ্রাম বাধিয়া গেল। তানাজী অসামান্য বীরত্ব দেখাইয়া শত্রুহস্তে জীবন দান করেন, তাঁহার সৈন্যেরাও ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল, এমন সময়ে সূর্য্যাজী দুইশত সৈন্যসহ ভীষণবেগে শত্রুসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল।

দ্বাদশ শত রাজপুত সৈন্যের অধিকাংশ রণক্ষেত্রে নিপতিত

হইল, কেহ কেহ পলায়ন করিল, অবশিষ্ট সৈন্য বিজয়ী সূর্য্যাজীর হস্তে বন্দী হইল। সিংহগড় শিবাজীর হস্তগত হইল। সূর্য্যাজীই তথাকার কেল্লাদার হইলেন। স্বদেশ-প্রেমিক তানাজীর অকালমৃত্যুতে শিবাজী মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন।

এদিকে আবাজী সোনদেব মাওলী দুর্গাধ্যক্ষ আলিবর্দ্দিকে হত্যা করিয়া উক্ত দুর্গ জয় করেন। ক্রমে পুরন্দর, কারনলা, লোহগড় শিবাজীর করায়ত্ত হইল। শিবাজীর সৈন্যেরা এই সময়ে জঞ্জিরার সিদ্দিদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা নৌ-যুদ্ধে বিশেষ দক্ষ বলিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারে নাই।

এই সময়ে শিবাজী দ্বিতীয়বার সুরাট লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। বিজয়লব্ধ ধনরত্নসহ যখন তিনি রায়গড়ে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে মোগলসেনাপতিরা বহুসংখ্যক সৈন্যসহ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। শিবাজী অল্পসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া মোগলদিগকে পরাজিত করেন। যুদ্ধের পর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। মোগলেরা সর্ব্বত্র পরাজিত হইতেছিল। শিবাজীর বিখ্যাত সেনাপতি প্রতাপ রাও খান্দেশ জয় করিয়া তথায় চৌথ ও সরদেশমুখী কর স্থাপন করিলেন। প্রতাপ রাও তাঁহার বিজয়বাহিনীসহ বেরারের পূর্ব্ব-প্রান্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে মোগলরাজ্য জয় করিয়া সেখানে কর স্থাপন করেন। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে মোরেপন্ত পিঙ্গলে অনেকগুলি দুর্গ জয় করেন।

বাগনল দেশের মনহার দুর্গ ইহাদের অন্যতম। পর বৎসর মোগলেরা আবার এই দুর্গটি অবরোধ করে। এই অবরোধ-কালে মারাঠাসৈন্য কেবল দুর্গ রক্ষা করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল এমন নহে, মারাঠা সেনাপতি মোরেপন্ত ও প্রতাপ রাও মোগলদিগের দর্প একেবারে চূর্ণ করিয়াছিলেন। মারাঠাসেনাপতিরা চারিদিক হইতে আক্রমণ করিয়া মোগলদিগকে ব্যস্তসমস্ত করিয়া তুলিলেন। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে মারাঠারা পানহলা জয় করিল। ঐ বৎসরই অন্নাজীদত্তো হাব্লি লুণ্ঠন করেন।

এই সময় শিবাজীর নৌ-সৈন্যেরা করবর উপকূল আক্রমণ করে। ঐ অঞ্চলের সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানগুলি শিবাজীর অধিকার-ভুক্ত হইল। বেদোনোরের রাজা তাঁহাকে করদানে স্বীকৃত হইলেন।

শিবাজীর রাজ্য এখন বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িল। উত্তরে সুরাট, দক্ষিণে হাব্লি ও বেদোনোর, পূর্ব্বে বেরার, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে। তদ্‌ভিন্ন তাপ্তীনদীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী মোগল সুবাগুলি হইতে তিনি চৌথ ও সরদেশমুখী কর পাইয়া থাকেন; বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও বেদোনোরের রাজারা করদ হইয়াছেন। বখর-প্রণেতাদের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—স্বীয় ভুজবলে তিনজন মুসলমান পাতশাহকে পরাজিত করিয়া শিবাজী স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে হিন্দু-পাতশাহ হইবার যোগ্যতা প্রমাণিত করিয়াছেন। ক্রমাগত ত্রিশ-

বৎসর কঠোর সংগ্রাম করিয়া শিবাজী একটি বিস্তৃত রাজ্যের অধিকারী হইয়াছেন। এক্ষণে যথারীতি অভিষিক্ত হইয়া আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া প্রচার করিবার বাসনা স্বভাবতঃই তাঁহার মনে উদিত হইতে পারে।

এতক্ষণে আমরা শিবাজীর কর্ম্মবহুল জীবনের শেষ অধ্যায়ে উপনীত হইয়াছি। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাভিষেকে তাঁহার জীবনের শেষাঙ্ক আরম্ভ হইয়া মৃত্যুতে পরিসমাপ্ত হয়।

১৬৭৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন, ১৫৯৬ শকের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে রায়গড়ে মহা আড়ম্বরের সহিত শিবাজীর রাজ্যাভি-ষেকোৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। এইরূপ প্রকাশ, এই উৎসব-দিনে রায়গড়ে পাঁচ লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল। কাশীবাসী তদানীন্তন প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত গাগাভট্ট অভিষেকানুষ্ঠানে প্রধান পুরোহিত ছিলেন। শিবাজীর দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পারসী সকলে নিজ নিজ দেবালয়ে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শিবাজী সর্ব্ব সম্প্রদায়ের দেবালয়ে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রচুর উপহার পাঠাইয়াছিলেন। শিবাজীর পিতা ইতঃপূর্ব্বেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন, তাঁহার ভাগ্যবতী জননী ও ধর্ম্মাচার্য্য রামদাস স্বামী এই সময়ে জীবিত ছিলেন। মাতৃভক্ত ও গুরুসেবক শিবাজী উভয়ের আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। অভিষেকসময়ে শিবাজী অসংখ্য কাঙ্গাল, ব্রাহ্মণ ও সাধুসজ্জনকে অপরিমিত ধনরত্ন দান করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি স্বর্ণস্তূপে আপনাকে ওজন করিয়া স্বীয় দেহভারপরিমিত স্বর্ণরাশি দান করিয়া

ছিলেন। ছত্রপতির অভিষেকদিন হইতে দাক্ষিণাত্যে "শিবাশক" নামক বৎসরগণনা-প্রণালী আরম্ভ হইয়াছে। কোহ্লাপুর রাজপরিবারে এখনো ঐ শক চলিত আছে।

অভিষেকের পর শিবাজীর জীবদ্দশায় মোগলেরা আর তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করে নাই। তখন তাহারা বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার রাজাদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। শিবাজীর সহায়তায় গোলকুণ্ডারাজ কিছুকাল মোগলের সহিত যুদ্ধে টিঁকিয়াছিলেন। বিপন্ন বিজাপুররাজকেও শিবাজী একবার সাহায্য করিয়া বিপন্মুক্ত করিয়াছিলেন। শিবাজীর বিজয়ী সৈন্যেরা তখন সুরাট হইতে বুরহানপুর পর্য্যন্ত মোগল-রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিল।

অভিষেকের অল্পকাল পরেই শিবাজীর মাতৃ-বিয়োগ হয়। মাকে হারাইয়া মাতৃভক্ত শিবাজীর বুক শোকে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। জননী তাঁহার বল, বুদ্ধি ও উৎসাহের প্রস্রবণ ছিলেন। জীবনের শেষ কয়টা বছর তিনি যুদ্ধ হইতে অবসর পাইয়া রাজ্যগঠনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ৫৩ বৎসর বয়সে চৈত্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে শিবাজী পরলোক-গমন করেন।

শিবাজীর রাজ্যগঠনপ্রণালী

যুদ্ধক্ষেত্রে শিবাজী যেমন তাঁহার অনন্যসুলভ বুদ্ধিমত্তা, সাহসিকতা ও অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, রাজ্যগঠনপ্রণালীতেও তেমনি তিনি তাঁহার প্রতিভার সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখাইয়া গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সমসাময়িক কিংবা পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু ও মুসলমান রাজাদিগের বিধিব্যবস্থা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করেন নাই।

শিবাজীর রাজ্যগঠনপ্রণালীর আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার অভিলাষী ছিলেন বলিয়া সমস্ত প্রাদেশিক রাজ্যগুলি ভাঙ্গিয়া চূরিয়া আপনার করায়ত্ত করিবার দুরাশা মনে পোষণ করিতেন না। সমস্ত রাজ্যগুলি আপন আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া ঐক্যসূত্রে এক হইয়া উঠিবে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। গোলকুণ্ডা, বিজাপুর, বেদনোর প্রভৃতি রাজ্য তাঁহার করদ ছিল; তিনি উহাদের শক্তি কখনো খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করেন নাই। মোগলরাজ্য হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী কর আদায় করিয়াই তিনি পরিতৃপ্ত ছিলেন। নিজ রাজ্য এবং মোগলাই বা মোগলদিগের শাসনাধীন রাজ্য—এই দুইয়ের মধ্যে তিনি চিরদিন পার্থক্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

শিবাজী শাসনসৌকর্য্যের নিমিত্ত তাঁহার রাজ্যকে চৌদ্দটা

"প্রান্তে" বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রান্তে অনেকগুলি গিরিদুর্গ ছিল। বখর-প্রণেতাদের মতে শিবাজীর রাজ্যের দুর্গসংখ্যা দুইশত আশীটার কম নহে। এই দুর্গগুলিই তাঁহার রাজ্যকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া দিবার প্রধান যন্ত্র ছিল। পুরাতন দুর্গ সংস্কারের নিমিত্ত এবং নূতন নূতন দুর্গ নির্ম্মাণার্থ শিবাজী মুক্তহস্তে অজস্র অর্থব্যয় করিতেন। প্রত্যেক দুর্গই সর্ব্বদা অস্ত্রশস্ত্রে সৈন্যসামন্তে এমনি সুসজ্জিত থাকিত যে, ইঙ্গিতমাত্রে তথাকার সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে নামিতে পারিত।

হাবিলদার উপাধিধারী একজন মারাঠা প্রত্যেক দুর্গের কর্ত্তা থাকিতেন। একজন ব্রাহ্মণ সুবেদার ও একজন প্রভু (কায়স্থ) কারখান্নিস (কারখানানবীশ) তাঁহার সহকারীর কার্য্য করিতেন। দুর্গপ্রাচীর রক্ষার নিমিত্ত আর কয়েকজন কর্ম্মচারী থাকিতেন। হাবিলদার ও তাঁহার সহকারীরা দুর্গস্থিত সৈন্যদলের পরিচালনা করিতেন। ব্রাহ্মণ সুবেদার দুর্গ ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলির দেওয়ানী ও রাজস্বসংক্রান্ত সর্ব্ববিষয়ের প্রধান বিচারক ছিলেন। উৎপন্ন শস্য, তৃণ ও দুর্গমধ্যস্থ সামরিক দ্রব্যাদি রক্ষার ভার প্রভুজাতীয় কর্ম্মচারীর উপর অর্পিত ছিল। প্রতিদুর্গেই সমান-সংখ্যক সৈন্য থাকিত না, দুর্গের আকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে সৈন্যসংখ্যার ন্যূনাধিক্য হইত। প্রতিদুর্গে দিবারাত্র পাহারার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবস্থা ছিল। দুর্গরক্ষাকার্য্যে সর্ব্বশ্রেণীর লোক নিযুক্ত করিয়া শিবাজী সকলের স্বার্থ রক্ষা করিতেন। প্রতি নয়জন সৈন্যের উপর একজন নায়ক নিযুক্ত থাকিত। সৈন্যেরা বন্দুক, নানা আকারের তরবারি, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র

ব্যবহার করিত। ছোটবড় সকল কর্ম্মচারীর বেতনের হার নির্দ্দিষ্ট ছিল।

রাজ্যের সমতল অংশ কতকগুলি মহাল ও প্রান্তে বিভক্ত হইয়াছিল। দুই তিনটি মহাল লইয়া এক একটি সুবা গঠিত হইত। সুবার কর্ত্তাদের উপাধি ছিল সুবেদার। সুবেদারের মাসিক বেতন প্রায় একশত টাকা ছিল। মোগলসম্রাট্দের ন্যায় শিবাজী রাজস্ব-আদায়ের ভার পাটিল, কুলকরণী বা দেশ-মুখদের হাতে অর্পণ করেন নাই। গ্রামের বা জিলার রাজকর্ম্মচারীরা প্রজাদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিত। এক একটা মহাল বা গ্রামের উপর রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিবার প্রথা শিবাজী তুলিয়া দিয়াছিলেন।

বখর-প্রণেতারা শিবাজীর শাসনপ্রণালীর দুইটি বিশেষত্ব বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন—প্রথমতঃ ইজারাদারী প্রথার রাহিত্য, দ্বিতীয়তঃ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগকে জায়গীরের পরিবর্ত্তে নির্দ্দিষ্ট হারে বেতন প্রদান।

জমিদারেরা সাধারণতঃ প্রজাদিগকে পীড়ন করিয়া অন্যায় ভাবে অতিরিক্ত কর আদায় করিয়া থাকেন এবং আদায়ী রাজস্বের যে-পরিমাণ রাজার প্রাপ্য রাজসরকারে তদপেক্ষা কম দিয়া থাকেন। উক্ত অন্যায় পীড়ন হইতে প্রজাদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত শিবাজী কর্ম্মচারীদের দ্বারা রাজস্ব আদায় করাইতেন। সাধারণতঃ মাঠে যখন শস্য জন্মিত, রাজকর্ম্মচারীরা তখন ভূমির পরিমাপ করিয়া রাজস্বের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতেন। প্রত্যেক প্রজাকে উৎপন্ন শস্যের দুইপঞ্চমাংশ

রাজস্ব দিতে হইত। অজন্মার বৎসর রাজকোষ হইতে প্রজাদিগকে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা হইত, পরবর্ত্তী চারি পাঁচ বৎসরে কিস্তিবন্দীমতে তাহা আদায় করিবার নিয়ম ছিল।

জিলার রাজকর্ম্মচারীরা পন্তঅমাত্য ও পন্তসচিবের অধীন। আটজন প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী শিবাজীর রাজ্যের শাসনচক্র চালাইতেন। পূর্ব্বোক্ত অমাত্যদ্বয় তাঁহাদেরই দুইজন। শিবাজীর এই প্রধান রাজকর্ম্মচারীরা ইতিহাসে 'অষ্টপ্রধান' নামে খ্যাত। পেশওয়ে বা মুখ্য-প্রধান রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী; শাসন, বিচার, সৈন্য-বিভাগ সর্ব্বদিকেরই তিনি প্রধান-কর্ত্তা, রাজসিংহাসনের দক্ষিণ-পার্শ্বে সর্ব্বপ্রথম আসনে তিনি উপবেশন করিতেন। মোরেপন্ত পিঙ্গলে এই পদে কার্য্য করিতেন। রাজার বামভাগের সর্ব্বপ্রথম আসনে সেনাপতি বসিতেন। হাম্বীর রাও মোহিতে এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। সিংহাসনের দক্ষিণ-ভাগে মুখ্যপ্রধানের পরে পন্ত-অমাত্য, পন্ত-সচিব ও মন্ত্রীর আসন ছিল। মন্ত্রীর সহিত রাজা তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যাপারের পরামর্শ করিতেন। সিংহাসনের বামপার্শ্বে সেনাপতির পরে যথাক্রমে সুমন্ত্র অর্থাৎ পররাষ্ট্রসংক্রান্ত মন্ত্রী, ন্যায়শাস্ত্রী বা ধর্ম্মবিভাগের প্রধান বিচারক, এবং ন্যায়াধীশ বা চিফ্ জাষ্টিস্ বসিতেন।

উল্লিখিতরূপে শিবাজী তাঁহার দেশের সর্ব্বপ্রধান বুদ্ধিমান্ ও শক্তিশালী লোকদিগকে লইয়া 'অষ্টপ্রধান' বা 'Board of ministers' গঠন করিয়াছিলেন। পাছে অযোগ্য ব্যক্তিরা

এই সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ পদলাভ করে, তজ্জন্য তিনি এই পদগুলি পুরুষানুক্রমিক করেন নাই। তিনি তাঁহার প্রথম পেশওয়ে শ্যামরাজকে পদচ্যুত করিয়া মোরেপন্তকে উক্ত পদ দান করিয়াছিলেন।

শিবাজী তাঁহার এই অষ্টপ্রধান কর্ম্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত কাহাকেও জায়গীর দান করেন নাই। তাঁহার জায়গীর প্রথার বিরোধী হইবার কারণ এই যে, জায়গীরদারেরা অনেক সময়ে এমন ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে যে, কোন অনিবার্য্য কারণে তাহাদিগকে পদচ্যুত করিতে হইলে তখন সৈন্যবর্গের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। দূরবর্ত্তী জায়গীরদারেরা অধিরাজের শাসনশক্তি হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া তাহাদিগের পক্ষে প্রবল হইয়া উঠা স্বাভাবিক। জায়গীরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা প্রবল হইয়া উঠিয়া রাজ্যের ভীতির কারণ হইবে মনে করিয়া শিবাজী জায়গীরপ্রথা রহিত করেন।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, শিবাজীর রাজ্যগঠন-প্রণালীর মধ্যে কোন দোষ না থাকিলে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত হিন্দুরাজ্য টিকিল না কেন? শিবাজীর পরবর্ত্তী মারাঠানায়কদের শাসনকালে মারাঠাদের অধিকার পূর্ব্বে কটক, পশ্চিমে কাঠিয়াওয়াড়, উত্তরে দিল্লী ও দক্ষিণে তাঞ্জোর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। তখন শিবাজীর রাজ্য-শাসনের বিধিব্যবস্থাগুলি আমূল অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া রাজ্যশাসন করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল শিবাজীর অধিকারে অধিবাসীরা এক ভাষাভাষী, তাঁহার রাজ

দুর্গ-জালে বেষ্টিত ছিল, সেই রাজ্যে ঐক্যরক্ষা অনেকটা সহজ ছিল, কিন্তু তাঁহার বংশধরগণের বিস্তৃত রাজ্যে ঐক্যরক্ষা তেমন সুসাধ্য ছিল না। তজ্জন্য পরবর্ত্তী মারাঠানায়কেরা শিবাজীর শাসনপ্রণালী লঙ্ঘন করিয়া নূতন প্রণালী অবলম্বন করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা শিবাজীর মত প্রতিভাশালী ছিলেন না। তাঁহাদের হাতে পড়িয়া শিবাজীর হাতে-গড়া সুদৃঢ় রাজ্য বাড়িতে বাড়িতে ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহাদের রাজ্যে ও মোগলাধীন রাজ্যে প্রভেদ রহিল না। কিছুকালের মধ্যেই অষ্টপ্রধান সভা নামেমাত্র পর্য্যবসিত হইল। পেশওয়ের প্রতাপে অপর সকলের শক্তি খর্ব্ব হইয়া গেল। পেশওয়ে পদ বংশগত হইল। রাজ্যের বড় বড় পদগুলি জায়গীরদারীতে পরিণত হইল। শাহুর রাজত্বের শেষভাগে পন্তসচিব ও পন্তঅমাত্যের পদ বিলুপ্ত হয়। পেশওয়ের পদ ও অপর বড় বড় পদগুলি বংশগত হওয়ায় অপদার্থ অকর্ম্মণ্যেরা রাজ্যচালনার ভার পাইতে লাগিল। ফলে দেশের শক্তিশালী ও গুণীরা অবজ্ঞাত হইতে লাগিলেন। রাজ্যমধ্যে ঘোর আত্মদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল। ঐক্যসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। এই অনৈক্যই মারাঠাজাতির পতনের কারণ।

শিবাজীর বংশধরগণ

মহাত্মা শিবাজীর মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র সম্ভাজী পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি তাঁহার পিতার আসনে বসিবার নিতান্ত অনুপযুক্ত ছিলেন। পিতার সাহস, বীরত্ব কিংবা চরিত্রবল কিছুই তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। রাজকার্য্যে তাঁহার বিন্দুমাত্র মনোযোগ ছিল না; দিবারাত্র নিকৃষ্ট আমোদপ্রমোদেই মত্ত থাকিতেন। সম্ভাজীর পরিণামও অতীব শোচনীয়। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্রাট্ অওরঙ্গজেবের হস্তে বন্দী হন। সম্রাট্ তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন—"তুমি আমার বন্দী, তোমার জীবনমৃত্যু আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে; তুমি যদি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ কর, তাহা হইলে মুক্তি পাইবে; অন্যথা তোমার মৃত্যু নিশ্চিত।"

সম্ভাজী বলিয়া পাঠাইলেন, "সম্রাট্ যদি তাঁহার কন্যাকে আমার সহিত বিবাহ দিতে সম্মত হন তাহা হইলে আমি মুসলমান হইতে পারি।" উক্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ উত্তর শ্রবণ করিয়া অওরঙ্গজেব ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন। তাঁহার আদেশে ঘাতকেরা উত্তপ্ত লৌহশলাকাদ্বারা সম্ভাজীর চক্ষু উৎপাটন করিল, তারপর জিহ্বা কাটিয়া ফেলিল; অবশেষে শিরশ্ছেদন করিয়া তাহাকে হত্যা করিল। সম্ভাজীর এরূপ নিদারুণ হত্যাকাণ্ডের কথা শুনিয়া সমস্ত মারাঠাজাতি উত্তেজিত হইল।

সম্ভাজীর ছয়বৎসরবয়স্ক পুত্র শাহু ইহার পর বন্দী

হইয়াছিলেন। শিবাজীর বন্ধনকালে মারাঠাজাতি নেতৃশূন্য হইয়াও যেমন আত্মশক্তির বলে টিঁকিয়া ছিল, এবারও ঠিক তাহাই হইল। নেতাকে হারাইয়াও শক্তিসম্পন্ন মারাঠাজাতি মোগলরাজশক্তির নিকট মাথা অবনত করিল না। তাহাদিগের প্রভুত্ব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। শাহুর অনুপস্থিতি-সময়ে সম্ভাজীর ভ্রাতা রাজারাম রাজকার্য্য পরিচালন করিতেন। অওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর শাহু মুক্তি পাইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। দীর্ঘকালের কারাবাসে তাঁহার চরিত্র বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা তাঁহাকে একেবারে অপদার্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথ তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হইলেন। বালাজী বিশ্বনাথ একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় দেশমধ্যে শাহুর ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার পরে পেশওয়ে বালাজী সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। শিবাজীর বংশধরগণের ক্ষমতা চিরদিনের মত চলিয়া গেল। তাঁহারা সেতারা ও কোহ্লাপুরে নামেমাত্র রাজা হইয়া রহিলেন।

পেশওয়েদিগের শাসন

প্রথম পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথ

মহারাজ শাহুর শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইল এবং মারাঠাজাতি উত্তরোত্তর শক্তিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল। পরবর্ত্তী পেশওয়েদের শাসনগুণে মারাঠাদের প্রভাব ভারতের চারিদিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। বালাজী বিশ্বনাথ দাক্ষিণাত্যের মোগল-রাজ্য হইতে চৌথ আদায়ের বাদসাহী পরওয়ানা পাইয়াছিলেন এবং প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গলকর অনেক রাজবিধান প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পেশওয়ে বাজীরাও

বালাজীর পুত্র বাজীরাও পেশওয়েদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি যেমন বুদ্ধিমান্ তেমনি বীর ছিলেন। শিবাজী আপন প্রতিভাবলে যে-জাতিকে ঐক্য দান করিয়া বলশালী করিয়া দিয়াছিলেন, বাজীরাও সেই জাতিকে সমস্ত ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করিলেন। বাজীরাও একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। মোগলসাম্রাজ্যের পতনোন্মুখ অবস্থা দেখিয়া তিনি একদিন রাজসভায় শাহুকে বলেন—"এখন আমাদিগের সুদিন ও সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। বিদেশীদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিয়া যশোলাভের এইতো প্রকৃষ্ট সময়।" বাজীরাওয়ের এই উত্তেজনাপূর্ণ বাক্য শুনিয়া শাহু মাতিয়া উঠিয়াছিলেন বটে,

পেশওয়ে—প্রথম বাজীরাও

কিন্তু তাঁহার উৎসাহ স্থায়ী হইল না। তিনি বাজীরাওকে বলিলেন—"তুমি তোমার পিতার উপযুক্ত পুত্র, তুমি স্বহস্তে ভারতবর্ষের সর্ব্বাংশে মারাঠাদের বিজয়পাতাকা উড্ডীন কর।"

বাজীরাও যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পটু ছিলেন। তিনি ক্রমাগত পনর বৎসরকাল যুদ্ধ করিয়া মুসলমানদিগের হস্ত হইতে মালব কাড়িয়া লইলেন, নর্ম্মদা হইতে চাম্বল পর্য্যন্ত মোগলরাজ্য জয় করিলেন। নিজাম পদে পদে বাজীরাওকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল-মনোরথ হইলেন। পুনঃপুনঃ পরাজিত হইয়া তিনিও শেষে পেশওয়ের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন। বাজীরাওয়ের সময়ে মারাঠারাজ্য বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাঁহার অপরিসীম ক্ষমতা দেখিয়া ইংরাজেরা ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে পেশওয়ের নিকট হইতে তাঁহারা মহারাষ্ট্রদেশে বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইলেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে বাজীরাওয়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বালাজী বাজীরাও পেশওয়ে পদ লাভ করেন। দ্বিতীয় পুত্র রাঘোবার ইংরাজমহলে খুব প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহারই আহ্বানে ইংরাজেরা মারাঠাদের রাষ্ট্র-ব্যাপারে প্রথম হস্তক্ষেপ করেন।

তৃতীয় পেশওয়ে বালাজী বাজীরাও

বালাজীর শাসনকালে মারাঠাদের শক্তি যারপরনাই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এতদিনে মারাঠাদের পূর্ণ-গৌরবের সময় উপস্থিত হইল।

বালাজী পেশওয়ে পদ লাভ করিয়াই এমন ভীষণভাবে

মোগলরাজ্য আক্রমণ করেন যে, মোগলদের মনে মহা আতঙ্ক জন্মিয়া গেল। তাঁহার ডাকনাম ছিল নানা সাহেব। নানা সাহেবের ভয়ে তখন ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিত। দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের অধিকার অনেক বাড়িয়া গেল। নাগপুরের ভোঁস্‌লেরা বাঙ্গলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করিল। বহু যুদ্ধের পর নবাব আলিবর্দ্দি বাঙ্গলার চৌথ প্রদান করিতে এবং উড়িষ্যা রাজ্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। বর্গী অর্থাৎ মারাঠাদের ভয়ে সকল দেশের লোক সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিত। কলিকাতার মারাঠা ডিচ্ বা খাত এই সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সময় হইতেই "বর্গী এল দেশে" এই ঘুমপাড়ানী গান প্রচলিত হইল।

বালাজীর সময়ে রাঘোবা একদল সৈন্য লইয়া পঞ্জাব অধিকার করেন এবং সেখান হইতে আমেদ সাহ দুরাণীর নিযুক্ত শাসনকর্ত্তাকে তাড়াইয়া দেন। আমেদ সাহ অতিশয় দুর্দ্দান্ত লোক ছিলেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে তিনবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া দিল্লী ও মথুরা প্রভৃতি নগর লুণ্ঠন করেন। দিল্লী এবং মথুরার পথঘাট অগণ্য নিরপরাধ ব্যক্তির রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল। আমেদ সাহ পঞ্জাব অধিকার করিয়া তথায় একজন শাসনকর্ত্তা রাখিয়া গিয়াছিলেন। মারাঠারা তাঁহার নিযুক্ত শাসনকর্ত্তাকে তাড়াইয়া দিয়াছে শুনিয়া তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না। তাহাদের দর্প চূর্ণ করিবার মানসে তিনি আবার ভারতবর্ষে আসিলেন। মারাঠারাও পশ্চাদ্‌পদ হইল না, সদাশিব রাও অনেক সৈন্যসামন্ত লইয়া উত্তর-

ভারতে উপস্থিত হইলেন। পাণিপথ ক্ষেত্রে উভয় সৈন্য সম্মুখীন হইল। ইতঃপূর্ব্বে এই ক্ষেত্রে দুইবার ভারতের ভাগ্যপরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। তৃতীয়বারের যুদ্ধের ফলও অতি ভীষণ হইল। উন্নতিশীল মারাঠাজাতির শোচনীয় পরাজয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। বালাজী স্বজাতির অধঃপাত স্বচক্ষে দর্শন করিয়া ভগ্নহৃদয়ে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মনে এমন গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল যে ছয় মাসের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

চতুর্থ পেশওয়ে মাধবরাও

বালাজীর মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র মাধবরাও পেশওয়ে পদ লাভ করেন। তিনি বড়ই দুঃসময়ে মারাঠাজাতির নায়ক হইয়াছিলেন। পাণিপথের যুদ্ধে মারাঠা শক্তি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এদিকে মারাঠাজাতি ক্রমে ক্রমে পেশওয়ে, ভোঁস্‌লে, শিন্দে, হোল্‌কার ও গায়কোয়াড় এই পাঁচটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হইয়াছে; প্রত্যেকেই প্রাধান্যলাভের নিমিত্ত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দেশের এই অবস্থা, তাহার উপর আবার পেশওয়ে ১৭ বৎসরের বালক। পিতৃব্য রাঘোবা তাঁহাকে নিজের হাতের পুতুল করিয়া স্বয়ং কর্ত্তা হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বয়সে বালক হইলেও মাধবরাও জ্ঞানে প্রবীণ ছিলেন। অনন্যসুলভ বুদ্ধিবলে

তিনি বিচ্ছিন্ন জাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেন। মারাঠা-নায়কেরাও তাঁহার অধীনে মিলিত হইল। হায়দর আলী তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ৩২ লক্ষ টাকা দিয়া অব্যাহতি লাভ করেন। দাক্ষিণাত্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া তিনি উত্তর-ভারতে রাজ্যবিস্তারের নিমিত্ত সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মাধবরাও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে হয়তো মারাঠাজাতি আবার পূর্ব্বগৌরব লাভ করিতে পারিত; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অসময়ে তাঁহার মৃত্যু হইল।

পঞ্চম পেশওয়ে নারায়ণরাও

মাধবরাওয়ের মৃত্যুর পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণরাও পেশওয়ে হইলেন। রাঘোবা তাঁহার অভিভাবক হইলেন। নারায়ণের বয়স তখন আঠার বৎসর মাত্র। রাঘোবা ষড়যন্ত্র করিয়া অল্পদিনমধ্যেই তাঁহাকে হত্যা করেন। এই সময় হইতেই পেশওয়েদের শক্তি খর্ব্ব হইয়া গেল। শিবাজীর বংশধরেরা সেতারা ও কোহ্লাপুরে যেমন নামেমাত্র রাজা, পেশওয়েরাও তেমনি পুণায় নামে মাত্র পেশওয়ে হইয়া রহি-লেন। জাতীয় ঐক্যবন্ধন চিরদিনের মতন ছিন্ন হইয়া গেল। তবুও বিচ্ছিন্নভাবে মারাঠানায়কেরা আরো কিছুকাল ভারতবর্ষে প্রবল রহিলেন।

আত্মদ্রোহ ও পতন

রঘুনাথরাও বা রাঘোবা

নারায়ণরাওয়ের হত্যার পরে পুণায় দুইটি দল হইল। একদল রাঘোবার পক্ষ, অপর দল মৃত নারায়ণ রাওয়ের বিধবা পত্নী গঙ্গাবাঈর পক্ষ। স্বামীর মৃত্যুকালে গঙ্গাবাঈ গর্ভবতী ছিলেন। অল্পদিন পরে তাঁহার একটি পুত্রসন্তান জন্মিল। শিশুর বয়স ৩০ দিন উত্তীর্ণ হইলেই নানা ফড়নবীশ প্রভৃতি প্রাচীন কর্ম্মচারীরা যথারীতি অভিষেক করিয়া শিশুকে পেশ-ওয়েপদে বরণ করিলেন। তাঁহার নাম রাখা হইল মাধবরাও নারায়ণ। রাঘোবা যে-আশা করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করিলেন, তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না। রাজ্যলাভ লালসায় তিনি উন্মত্ত হইয়া শিন্দে, হোল্‌কার প্রভৃতির সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কেহই ভ্রাতুষ্পুত্রহন্তাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন না। অনন্যোপায় হইয়া তিনি ইংরাজদের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা পাপিষ্ঠ রাঘোবাকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। রাঘোবার পক্ষ হইয়া ইংরাজেরা যুদ্ধক্ষেত্রে নামিলেন।

তলেগাঁও নামক স্থানে ইংরাজের সহিত মারাঠাদের প্রথমে যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে ইংরাজপক্ষের পরাজয় হওয়াতে বড়গাঁয়ে তাঁহারা এক সন্ধি করেন। সুপ্রীম গবর্ণমেণ্ট সেই সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া ভিন্ন প্রকারের প্রস্তাব পাঠাইলেন। মারাঠারা সেই প্রস্তাবে সম্মত হইল না। উভয় পক্ষ আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত

হইল। এবার বুন্দেলখণ্ড হইতে জেনারেল গডার্ড সসৈন্যে চলিয়া আসিলেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি মারাঠাদিগকে আংশিকভাবে পরাজিত করিয়া বসঈ বা বেসীন জয় করেন।

ওদিকে মান্দ্রাজ অঞ্চলে ইংরাজেরা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। হায়দার আলী কর্ণাট আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে ইংরাজের সমস্ত সৈন্যসামন্ত প্রেরিত না হইলে কিছুতেই তাঁহাকে পরাস্ত করা যাইবে না। সুতরাং পেশওয়েকে হাত করিয়া অচিরে একটা সন্ধি করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িল। ইংরাজেরা দ্রুতগতি পুণা আক্রমণ করিতে চলিলেন। এক পর্ব্বতের নিকটে আসিয়া ইংরাজসৈন্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়। সহসা মারাঠারা উভয় সৈন্যের মাঝখানে প্রবেশ করিয়া ইংরাজের উপর ভীষণভাবে পতিত হইল। এই যুদ্ধে ইংরাজদের বিস্তর ক্ষতি হইল। দেশীয় ও ইয়ুরোপীয় ৪৬১ জন সেনা হত এবং কামান ও নানা দ্রব্য মারাঠাদের হস্তগত হইল।

সালবাই নামক স্থানে উভয় পক্ষে সন্ধি হইল। ইংরাজেরা সালসিটি ও এলিফেন্টা পাইলেন, এবং তাঁহারা রাঘোবার পক্ষ ত্যাগ করিলেন। মাধবরাও পেশওয়ে হইলেন, রাঘোবার বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল। এইরূপে প্রথম মারাঠা যুদ্ধের অবসান হয়।

মাধবরাও নারায়ণ

শিশু মাধবরাও নারায়ণকে নামেমাত্র পেশওয়ে করিয়া নানা ফড়নবীশ কর্ত্তা হইলেন। এই সময়ে গোয়ালিয়রে

মাধবজী শিন্দে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। মাধবজী পূর্ব্বে পেশওয়ের ভৃত্য ছিলেন; অসামান্য বুদ্ধিবলে ক্রমে তিনি স্বাধীন নায়ক হইয়া উঠেন। পাণিপথ যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় উত্তর-ভারতে মারাঠাদের শক্তি খর্ব্ব হইয়াছিল। মাধবরাও আবার উত্তর-ভারতে মারাঠাদের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি দিল্লীর নামমাত্র বাদসাহ সাহ আলমকে হস্তগত করিয়া স্বয়ং তাঁহার সেনাপতি হন এবং পেশওয়ের জন্য উজীরী সনন্দ আদায় করেন। শিন্দের ক্ষমতা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। দিল্লীর বাদসাহ তাঁহার হাতের মুঠার ভিতরে; পেশওয়েও তাঁহার সম্মতি না লইয়া কোন কার্য্য করিতেন না। পুণা দরবারে একজন দূত রাখিবার জন্য ইংরাজেরাও শিন্দের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। ম্যালেট সাহেব দূতরূপে পুণা দরবারে স্থান পাইলেন।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা মারাঠাদের সাহায্যে টিপু-সুলতানকে পরাস্ত করিয়া অনেক রাজ্য লাভ করেন। বিজয়লব্ধ রাজ্যের তৃতীয়াংশ পেশওয়েকে দেওয়া হইল। ইংরাজেরা আরও কতক রাজ্য দিয়া এই সময়ে পুণায় একদল সৈন্য রাখিতে চাহিয়াছিলেন। শিন্দের পরামর্শে পেশওয়ে তাহাতে সম্মত হইলেন না।

উত্তর-ভারতে শান্তি স্থাপন করিয়া ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে শিন্দে পুণায় ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে তিনি পেশওয়েকে বাদসাহী উজীরী সনন্দ প্রদান করেন। এই উপলক্ষে পুণায় খুব আড়ম্বর হইয়াছিল।

নানা ফড়নবীশের সহিত শিন্দের বিশেষ সদ্ভাব ছিল না; কারণ নানা ফড়নবীশ ইংরাজদের ঘোর বিদ্রোহী ছিলেন, শিন্দে তাহাদের কিঞ্চিৎ পক্ষপাতী ছিলেন। উভয়ের মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাইয়া ভীষণ কাণ্ড ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। এমন সময়ে সহসা শিন্দের মৃত্যু হওয়াতে সব গোলমাল চুকিয়া গেল।

নানা ফড়নবীশ

পেশওয়ের অভিভাবক হইয়া নানা ফড়নবীশ ক্রমে ক্রমে দাক্ষিণাত্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হইয়া উঠেন। ফড়নবীশ ইংরাজের বিপক্ষ ছিলেন। তিনি ইংরাজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, তত দিনের মধ্যে ইংরাজেরা পুণায় সৈন্য রাখিতে পারেন নাই।

ফড়নবীশ সাতিশয় ক্ষমতাপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার ক্ষমতা বিন্দুমাত্র লঙ্ঘিত হইলে অতি অসহিষ্ণু হইয়া পড়িতেন। তাঁহার আদেশে পেশওয়ে মাধবরাও নারায়ণের বিশেষ স্বাধীনতা ছিল না; তিনি তাঁহাকে সর্ব্বদা চক্ষে চক্ষে রাখিতেন। পেশওয়ে যতদিন শিশু ছিলেন, ততদিন এই ব্যবহার তাঁহাকে পীড়িত করিলেও, তাহা একেবারে অসহ্য হইয়া উঠে নাই। এখন পেশওয়ে বিংশবৎসর-বয়স্ক হইয়াছেন। এ বয়সে পিতামাতার অনুশাসন পালনেই যুবকদিগের তাদৃশ প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় না। নানা ফড়নবীশের ন্যায় কর্ম্মচারীর শাসন তরুণবয়স্ক মাধবরাওয়ের পক্ষে তীব্র পীড়াদায়ক হইবে, ইহাতে

বিচিত্র কি ? এই পরাধীনতার জ্বালা অনুভব করিবার একটি বিশেষ কারণও উপস্থিত হইল।

নানা ফড়নবীশ রাঘোবার তিন পুত্রকে জুন্নরে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র বাজীরাও বাক্‌পটুতায় অদ্বিতীয় ছিলেন। মাতাপিতার চরিত্রের বহুদোষ তাঁহাতে সংক্রামিত হইয়াছিল। এই কারণে নানা ফড়নবীশ তাঁহার সংস্রব হইতে মাধবরাওকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাজীরাওয়ের উপর তরুণ পেশওয়ের খুব টান ছিল, গোপনে উভয়ের মধ্যে চিঠির আদানপ্রদানও চলিত।

একদিন এক পত্রে সুচতুর বাজীরাও লিখিয়াছিলেন—"ভাই, আমরা দুই জনেই বন্দী, তুমি পুণায় আর আমি জুন্নরে। কিন্তু ভাই, আমার মন স্বাধীন, ভালবাসার উপর কাহারো হস্তক্ষেপ করিবার সাধ্য নাই।" দুর্ভাগ্যক্রমে পত্রের মর্ম্ম নানা ফড়নবীশ জানিতে পারিলেন। তিনি মাধবরাওকে যারপরনাই তিরস্কার করেন। সেই মনোদুঃখে মাধবরাও আত্মহত্যা করেন। এই দুর্ঘটনায় ফড়নবীশের ক্ষোভের অবধি রহিল না।

আবার পেশওয়ে পদ লইয়া লড়াই বাধিয়া গেল। অনেক গোলযোগের পরে রাঘোবার পুত্র বাজীরাওকেই পেশওয়ে পদে বরণ করা হইল। বাজীরাও নানা ফড়নবীশকে কিছুকালের নিমিত্ত বন্দী করিলেন। পরে তিনিই প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নানা ফড়নবীশের মৃত্যু হইল।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ

শেষ পেশওয়ে দ্বিতীয় বাজীরাও

পুণা দরবারে নানা ফড়নবীশের তুল্য দূরদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তি আর কেহ ছিলেন না। পেশওয়েদিগের রাজ্যের যাহা কিছু বলবুদ্ধিগৌরব অবশিষ্ট ছিল, ফড়নবীশের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহাও বিলুপ্ত হইল। মহারাষ্ট্রদেশে ভীষণ অরাজকতা দেখা দিল। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নায়কেরা সৈন্যবল সংগ্রহ করিয়া আত্মপ্রাধান্যস্থাপনের নিমিত্ত পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। যশোবন্ত রাও হোল্‌কার এই সময়কার প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। এতদিন শিন্দে ক্ষমতাশালী ছিলেন, এখন যশোবন্তের প্রতাপে শিন্দের নায়ক দৌলতরাওও নতগ্রীব হইলেন। উভয়ে সংগ্রাম চলিতে লাগিল। বাজীরাও শিন্দের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শিন্দের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত তিনি সামান্য অপরাধে যশোবন্তের ভ্রাতা বিঠোজীকে যারপরনাই নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করেন। যশোবন্তরাও ছাড়িবার লোক নহেন; তিনি ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য পুণা আক্রমণ করিতে চলিলেন। শিন্দে ও পেশওয়ে মিলিত হইয়া পথিমধ্যে তাঁহার গতিরোধের চেষ্টা করেন। সংগ্রামে হোল্‌কার বিজয়ী হইলেন। পুণায় গমন করিয়া তিনি বাজীরাওয়ের ভ্রাতা অমৃতরাওকে পেশওয়ের আসনে বসাইলেন।

বাজীরাও প্রাণভয়ে পলায়ন করেন। নানা স্থানে ঘুরিয়া তিনি বাসীন বন্দরে যাইয়া ইংরাজের শরণাপন্ন হইলেন। ১৮০২

খৃষ্টাব্দের ৩১এ ডিসেম্বর এক সন্ধিতে স্থির হইল যে, ইংরাজেরা বাজীরাওকে পুণার সিংহাসনে বসাইয়া দিবেন, তিনি তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে কাহারো সহিত যুদ্ধবিগ্রহ করিতে পারিবেন না ও একদল ইংরাজ সৈন্য পোষণ করিবেন, এবং ঐ সৈন্যদলের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ২৬ লক্ষ টাকা আয়ের ভূ-সম্পত্তি ইংরাজদের হস্তে গচ্ছিত রাখিবেন।

পেশওয়ের পক্ষ হইয়া ইংরাজেরা আবার যুদ্ধক্ষেত্রে নামিলেন। তাঁহারা বাজীরাওকে পেশওয়ের আসনে বসাইলেন; অমৃতরাওকে বার্ষিক আট লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া কাশীতে পাঠাইয়া দিলেন।

অপর মারাঠা-নায়কেরা ইহাতে দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা বাসীনের সন্ধি মানিয়া চলিতে অস্বীকৃত হওয়ায় আবার যুদ্ধ বাধিল। শিন্দে, হোলকার ও অপর নায়কেরা যুদ্ধক্ষেত্রে নামিলেন। জেনারেল ওয়েলেস্‌লি আসাই ও আরগাঁওয়ের যুদ্ধে এবং জেনারেল লেক দিল্লী ও লাসোয়ারির যুদ্ধে একে একে মারাঠা-নায়কদিগকে পরাস্ত করিলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই গায়কোয়াড়, শিন্দে ও ভোঁস্‌লে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের নিকট মাথা নত করিলেন। একমাত্র হোল্‌কার সহজে বশীভূত হইলেন না। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ভরতপুরের নিকটবর্ত্তী ঢিগে নামক স্থানের যুদ্ধে হোল্‌কারেরও দর্প চূর্ণ হইল।

দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধে জয়ী হইয়া ইংরাজ কেবলমাত্র মহারাষ্ট্র দেশে প্রাধান্য লাভ করিলেন এমন নহে, তাঁহারা সমগ্র ভারতবর্ষের একরূপ প্রভু হইলেন।

বাজীরাও ইংরাজের সহায়তায় পেশওয়েপদ লাভ করিয়া অল্পদিনমধ্যেই বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি যাহা লাভ করিয়াছেন, তাহা কিছুমাত্র লোভনীয় নহে। তাঁহার কোন ক্ষমতাই ছিল না। এখন তিনি পূর্ব্ব গৌরবলাভের নিমিত্ত গোপনে গোপনে ইংরাজদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বাজীরাওয়ের চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়া তাঁহার হস্তে যতটুকু ক্ষমতা ছিল, তাহাও কাড়িয়া লইলেন। বাজীরাও বিদ্রোহী হইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। মারাঠা-নায়কেরাও একে একে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ৫ই নবেম্বর খড়কী নামক স্থানে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। ইংরাজপক্ষে মাত্র ২৮০০ সৈন্য ছিল। মারাঠাদের সৈন্যসংখ্যা ছয় সহস্রের ন্যূন ছিল না। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্তের মধ্যে ছয় সহস্র সৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল।

ইংরাজেরা পেশওয়ের রাজ্য কাড়িয়া লইলেন। সাতারায় শিবাজীর এক বংশধরকে রাজা করিলেন। আট লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া বাজীরাও কাণপুরের নিকটবর্ত্তী বিঠুর নামক স্থানে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের নজরবন্দী হইয়া রহিলেন। শিন্দে, হোল্‌কার, গায়কোয়াড়, ভেঁাস্‌লে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আশ্রিত হইয়া নিজ নিজ রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে নাগপুরের ভেঁাস্‌লে অপুত্রক মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তাঁহার রাজ্য গবর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। হোল্‌কার, শিন্দে ও গায়কোয়াড় এখনো ইংরাজের আশ্রয়ে রাজা রহিয়াছেন।